প্রথম প্রকাশ
জ‍ুলাই : ১৯৩৩

সংক্রান্তি

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

এই তিনটি নাটক প্রথম যে-যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো তাদের নাম নিচে উল্লেখ করছি :

সংক্রান্তি — 'দেশ', শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭০
প্রায়শ্চিত্ত — 'কল্প-বাণী'
ইক্কাকু সেন্নিন — 'কলকাতা'

প্রতি নাটকের শেষে রচনার তারিখ মুদ্রিত আছে।

শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী প্রুফ দেখায় আমাকে সাহায্য করেছেন।

বু.ব.

সংক্রান্তি

চরিত্র

ধৃতরাষ্ট্র

সঞ্জয়

গান্ধারী

[হস্তিনাপুরে রাজপুরীর একটি প্রাঙ্গণ। যষ্টি দিয়ে ভূমি অনুভব করতে-করতে ধৃতরাষ্ট্র প্রবেশ করলেন।]

ধৃতরাষ্ট্র

দিন, বদান্য দিন, উষ্ণতার উৎস,
যাতে সর্বজীব জেগে ওঠে চঞ্চল,
পাখি নাড়ে ডানা, গান গায় পতঙ্গ,
আর মানুষেরা যে যার পাপে লিপ্ত হয় আবার—
দিন, আলো, স্বর্গের বিভা, জগৎ যাতে উদ্ভাসিত,
কিন্তু কেউ-কেউ কখনোই যা দেখতে পায় না :
তোমাকে নমস্কার জানাই
আমি,

সংক্রান্তি

অন্ধ, বৃদ্ধ, অক্ষম, অসহায়
ধৃতরাষ্ট্র।
দীর্ঘ ছিলো এই রাত্রি, দীর্ঘতর আমার পক্ষে,
হিম, হিমতর এই শীতের রাত্রি,
হিমতর শোণিত, ক্ষীণতর ধমনী,
কম্বল, কার্পাশ, আর পশুরোমের আবরণ সত্ত্বেও।
অস্থির নিদ্রার পরে গাঢ়তর ক্লান্ত,
আমি শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছি তোমার কাছে,
হে সূর্য, ধর্মের প্রতিভূ, পৃথিবীর প্রতিপালক,
তোমার অনন্ত দানসত্র থেকে একমুঠো তাপের জন্য প্রার্থী —
আশা নয়, শান্তি নয়, সান্ত্বনা নয় —
শুধু একমুঠো জৈব উত্তাপ, দেবতার স্পর্শ,
যার কিছু নেই, সেই বৃদ্ধেরও যা প্রাপণীয়।

চক্ষুষ্মান সূর্য, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো আমাকে?
বিচিত্র এই জগৎ, কুরুক্ষেত্র ঘটনাময়,
তবু একবার মুহূর্তের জন্য আমার দিকে
দৃষ্টিপাত করো, দেবতা!
দ্যাখো : আমার শতপুত্র ছিলো অর্ধমাস আগেও,
আজ একজন মাত্র অবশিষ্ট।
ছিলো অগণ্য জ্ঞাতি, বন্ধু, সামন্ত,
অক্ষৌহিণী সেনানী —
আজ সিংহভুক্ত মহিষের মতো কঙ্কালসার।
আমি ছিলাম ভরতবংশীয় রাজা, রাজপিতা,
জঠরাগ্নিতে অন্নের মতো জীর্ণ সেই রাজত্ব আজ,

এমনকি আমার পিতৃত্ব
একটিমাত্র ক্ষীণ সূত্রে কম্পমান।
তবু দ্যাখো — এখনো —
আমি হ'য়ে যাইনি উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি
আছি এখনো আর্য,* সচেতন ও মননশীল,
পশুর মতো আর্তনাদ করি না, বাক্য ব'লে থাকি যুক্তিসংগত।
ঘুরে এসো, সূর্য, ঘুরে এসো বিপুল এই পৃথিবী,
সহস্র চোখে তাকিয়ে দ্যাখো দশ দিকে
কোথাও আছে কিনা
কোনো গ্রামে বা অরণ্যে, কোনো প্রাসাদে বা পর্ণশালায়
আমার মতো দুঃখী কোনো মানুষ।

না — বেদনাতেও দম্ভ নয় শোভন।
আমার শোক, তুমি নম্র হও। ভাবো :
যুগে-যুগে ভাগ্যদোষে সন্তপ্ত হয়েছিলেন
কত কীর্তিমান বীর, লোকশ্রুত রাজা,
কত ঋষি মুহূর্তের ভুলে অভিশপ্ত,
স্বয়ং ইন্দ্র স্বর্গচ্যুত কতবার।
আর
যাকে গর্ভে ধরেছিলো অনিচ্ছায় এক নারী,
এক শঙ্কাময় শয্যায় যার আরম্ভ,
সেই শূন্যসার আধার, শুধু সম্বোধনে রাজা,
শুধু জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয়, কোনো কর্ম করেনি কখনো ·

* এখানে 'আর্য' শব্দের অর্থ : সুসভ্য।

কিছুই করেনি—শুধু কথা শুনেছে, কথা বলেছে,
আর মনে-মনে
অনেক, অনেক চিন্তা ক'রেও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি-
অন্ধ, ভীরু, অক্ষম,
অপ্রতিষ্ঠ, ব্যর্থনামা ধৃতরাষ্ট্র—
তার দুঃখে···কী এসে যায়?

কবিরা সত্য বলেছেন:
জীবন দুঃখের, শুধু মোক্ষলাভে শান্তি।
কিন্তু যেহেতু এই দীর্ঘজীবনেও আমার
সুকৃতির কোনো সঞ্চয় নেই, কোনো সোচ্চার দুষ্কৃতিও নেই,
তাই জানি, মোক্ষ আমার শতজন্ম দূরে এখনো।
আর তাই—
বসুন্ধরা, মাতা পৃথিবী, শাশ্বতী,
লক্ষ যুগ ধ'রে ধর্ষিত হ'য়েও নিত্যযৌবনা,
মানুষের পাপে নিষ্পিষ্ট হ'য়েও স্বাস্থ্যবতী,
লোভে, কামে বিক্ষত হ'য়েও বরদাত্রী—
আজ, এক ভীষণ দিনের প্রত্যুষে
তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই, দেবী,
তোমার অফুরান ভাণ্ডার থেকে ভিক্ষা দাও আমাকে
একবিন্দু ক্ষমা, কণামাত্র ধৈর্য,
যাতে বিনা আক্ষেপে সহ্য করতে পারি
আমার অবশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট এই জীবন—
যতদিন না অন্য এক মাতা আমাকে আশ্রয় দেন।

ঐ—পায়ের শব্দ।
আসছে
আমার বহুকালের সঙ্গী, অধুনা একমাত্র,
অধুনা আমার চক্ষু, আমার কর্ণধার,
ব্যাসের বরে দিব্যদৃষ্টি পেয়ে
যে দেখতে পাচ্ছে রাজপুরী থেকে রণক্ষেত্রে,
আর আমাকে শুনিয়ে যাচ্ছে
সেই বিবর্ধমান সর্বনাশের বিবরণ—
আমারই দোষে উৎপন্ন, কিন্তু হয়তো অন্যদের দোষেও।

সঞ্জয়

(প্রবেশ ক'রে)

কুরুপতি, প্রণাম। আপনি একা এখানে?

ধৃতরাষ্ট্র

এই তো নির্দিষ্ট স্থান, সঞ্জয়,
এই বেদীমণ্ডিত নিভৃত প্রাঙ্গণ,
সেখানে তুমি বক্তা, আমি শ্রোতা—দু-জনেই সমান মনোযোগী—
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত,
যতক্ষণ
আমার পুত্রগণ হত্যা করছে পরস্পরকে।

সঞ্জয়

(আবেগহীন স্বরে)

হত্যা নয়, প্রভু—প্রতিকার, সংহার, সংবরণ
মহান আদর্শের জন্য অপসারণ,

সংক্রান্তি

পাপের প্রক্ষালন, দুর্নীতির দূরীকরণ,
ধর্মের সংস্থাপন এই জগতে।

ধৃতরাষ্ট্র

(ঈষৎ তিক্ত স্বরে)

মহান আদর্শ! ধর্মরাজ্য!
তুমিও তা-ই বলো, সঞ্জয়?

সঞ্জয়

মন্ত্রণাসভায় একবার যা শুনেছিলাম,
আমি তারই পুনরুক্তি করছি। আমি কিছু বলি না।

ধৃতরাষ্ট্র

কূটনীতি নয়, সতর্কতা নয়,
আমি তোমার কাছে সরল সত্য শুনতে চাই।
শাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে, তত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে—
যেমন বন্ধু কথা বলে বন্ধুর সঙ্গে,
বা পতির সঙ্গে রহস্যালাপে কান্তা,
তেমনি ক'রে
বলো আমাকে, সঞ্জয়,
তোমার কি মনে হয় কুরুক্ষেত্র
ধর্মক্ষেত্র? এই যুদ্ধ
ধর্মযুদ্ধ?

সঞ্জয়

ভরতশ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন,
যা বহুবার নিষ্ফলভাবে বিতর্কিত হ'য়ে গেছে,
আর আজকের দিনে যা আশাহীনভাবে সর্বজনীন,
তার উত্তর আমি কী ক'রে জানবো?
আমার বৃত্তি সূতের। আপনার সেবায়
আমি আছি সারথিরূপে নিযুক্ত—কখনো দূত, আর সম্প্রতি
আপনার পিতার আজ্ঞায়, আপনারও ইচ্ছা অনুসারে
আমি হয়েছি কথক, ঘটনার বিবৃতিকার,
শুধু বার্তাবহ—ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক নই।

ধৃতরাষ্ট্র

কিন্তু বিবরণেই প্রচ্ছন্ন থাকে মন্তব্য,
ঘটনা নিজেই নিজের ব্যাখ্যাতা।
শোনো, সঞ্জয় :
এতদিন ধ'রে যত বার্তা তুমি শোনালে—
শুধু আমাকে নয়, হয়তো বা জগৎবাসীকেও—
আজ আমার মুখে শোনো তার চুম্বক।
বলো তো, কেমন ক'রে ভূলুণ্ঠিত হলেন
কৌরবপক্ষের অমিতবল বীরবৃন্দ?
দশম দিনে, সুকৌশলে গুপ্ত কথা জেনে নিয়ে
এক নপুংসকের পশ্চাৎবর্তী মহাযোদ্ধা অর্জুন
ভীষ্মকে আলম্বিত করলো শরশয্যায়।
চতুর্দশ দিনে ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ;

একজনের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করলো
সেই একই বিখ্যাত কুন্তীপুত্র, আর তারই শিষ্য সাত্যকি
অস্ত্রহীন, ধ্যানস্থ, মুমূর্ষু পুরুষের
শিরশ্ছেদ করলো বীরদর্পে। আর সিন্ধুরাজ—আমার জামাতা-
তাঁরও হাতে অস্ত্র ছিলো না, যখন কপট সূর্যাস্তের পরে
তার মস্তক ঊর্ধ্বাকাশে উত্থিত হ'লো — বীভৎসভাবে।
তারপর
পঞ্চদশ দিনে দ্রোণ, সপ্তদশ দিনে কর্ণ · · ·
থাক, আর বলা বাহুল্য।
কে না বোঝে, সঞ্জয়,
উত্তরকালে কুরুবংশের কাহিনী শুনে
ভূমণ্ডলে কে না বলবে—
'শৌর্যে নয়, বিক্রমে নয়, পৌরুষে নয়—
পাণ্ডবেরা ছলনায় ছিলো দক্ষতর,
নৃশংসতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী!'
ছলনা — প্রবঞ্চনা — মিথ্যাচার—
পদে-পদে বিশ্বাসভঙ্গ,
পদে-পদে নিয়মলঙ্ঘন,
শরণার্থীকে হত্যা, মৃতকল্পকে হত্যা,
শত্রুর ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে নৃত্য,
মৃতের গাত্রে পদাঘাত, তরক্ষুর মতো রক্তপান—

(মুহূর্তকাল নীরবতার পরে)

আমি, ভাবিনি, সঞ্জয়, আমার দীর্ঘ জীবনে কল্পনাও করিনি
এই বন্য, বর্বর, উন্মত্তের মতো আচরণ—

ম্লেচ্ছ কিরাত দস্যুর পক্ষেও যা লজ্জাকর—
তা সম্ভব হ'তে পারে
ক্ষত্রবংশে, ভরতবংশে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে—
একমাত্র দেশ
যেখানে দেবগণ দেবভাষাতেই অর্চিত হন।

অভিনন্দন জানাই তোমাদের,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,
ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, আর আমার আত্মজ ঊনশত পুত্র-
অভিনন্দন!
তোমরা কখনো অন্যায় যুদ্ধ করোনি,
ছিলে মৃত্যুর মুখেও সত্যনিষ্ঠ,
তোমাদেরই মতো ক্ষত্রিয়ের পুণ্যে
পবিত্র এখনো ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নি।

সঞ্জয়

যজ্ঞাগ্নিও নির্ধূম নয়, প্রভু
তাতেও আছে অনিবার্য কালিমা।

ধৃতরাষ্ট্র

(অসহিষ্ণু স্বরে)

আর শুনতে চাই না পুরোনো কথা—
আমার পুত্রেরা কী করেছিলো, বা করেনি!

শুধু বলো, যুদ্ধকাণ্ডে
কৌরবের কলঙ্ক কোথায়?

সঞ্জয়

আমি শুনেছি তীব্র নিন্দা পাণ্ডবশিবিরে
একের বিরুদ্ধে ব্যূহবন্ধ সপ্তরথীর।

ধৃতরাষ্ট্র

(সরোষে)

অবিশ্বাসী! তুমিও তবে পাণ্ডবের পক্ষপাতী!
দূর হও—আমার সান্নিধ্য থেকে দূর হও!

সঞ্জয়

(শান্তভাবে)

আপনি কাকে ভর্ৎসনা করছেন, মহারাজ?
আমি কি নিজের চোখে দেখিনি
অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা শুনতে-শুনতে
আপনার দৃষ্টিহীন নেত্রকোটর থেকে কুঞ্চনময় কপোল পর্যন্ত
নিঃসৃত হ'য়ে
কয়েক বিন্দু অশ্রু
লুক্কায়িত হ'লো শ্বেত শ্মশ্রুদামে—যেন লজ্জায়?

ধৃতরাষ্ট্র

অশ্রুপাত পুরুষের পক্ষে অনুচিত,
রাজবংশে অশিষ্ট ব'লে গণ্য।

আর দেহস্থিত রস রক্ত মজ্জার মতোই
বৃদ্ধের চোখে অশ্রুর উৎস শুকিয়ে যায়।
তবু—সেই মুহূর্তে আমার আত্মবিস্মৃতি—
যেহেতু আমার পৌত্র সে—নবযুবক—সদ্যবিবাহিত—
ভাগ্যহীন! কিন্তু তাই ব'লে
আমি কখনো ভাবিনি—কেউ যেন মুহূর্তের জন্য না ভাবে—
যে কৌরবেরা অপরাধী। কেননা যুদ্ধ কোনো অপরাধ নয়, ধর্ম।
আর, বনভূমিতে মাতঙ্গদল ধাবিত হ'লে
যেমন লুপ্ত হ'য়ে যায় হরিণ-শশকের পদচিহ্ন,
তেমনি উৎপাটিত হয় করুণা
রণক্ষেত্রে, যোদ্ধার প্রতি পদক্ষেপে।
যাও, সঞ্জয়, আবার যাও পাণ্ডবশিবিরে,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করো সেখানে :
'কৌরবেরা সম্মুখীন যুদ্ধে শৌর্য দেখিয়েছিলেন, প্রবঞ্চনা
করেননি।'

[সঞ্জয় নিরুত্তর। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। নেপথ্যে শঙ্খনাদ।]

ধৃতরাষ্ট্র

(চকিত স্বরে)

সঞ্জয়, তুমি কোথায়? তুমি আছো তো এখানে?
আমাকে পরিত্যাগ করোনি তো?

সঞ্জয়

আমি উপস্থিত আছি, কুরুপিতা। যুদ্ধারম্ভের সংকেত হ'লো।

আজ অষ্টাদশ দিন। ব্যাসের উক্তি :
এই দিনে যুদ্ধের অবসান। আপনি কি আজও শুনতে চান?

ধৃতরাষ্ট্র

আমি প্রত্যহ থাকি উৎকর্ণ,
কিন্তু আজ আমি সর্বদেহে শ্রুতিময়,
যেহেতু আমার প্রতীক্ষা আজ শেষ হবে।

সঞ্জয়

শল্য, সতী মাদ্রীর সহোদর,
বৃত হলেন
কৌরবপক্ষের চতুর্থ সেনাপতি।

ধৃতরাষ্ট্র

(সোৎসাহে)

জয়ী হও, শল্য!

সঞ্জয়

প্রভু, আপনার মনে পড়ে
যখন নির্বাসিতেরা সবেমাত্র প্রত্যাগত,
আর চেষ্টা চলছে বিনা যুদ্ধে মীমাংসার,
আপনি আমার মুখে পান্ডবসভায় বার্তা পাঠিয়েছিলেন :
'জয়ে মঙ্গল নেই, পরাজয়ে মঙ্গল নেই, শুভ শুধু মৈত্রী।'

ধৃতরাষ্ট্র

(উষ্মার স্বরে)

রাখো তোমার অবান্তর কথা!
বললে না তুমি ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক নও?
তবে কেন প্রগল্‌ভের মতো পরমুহূর্তেই
মঙ্গলবিধানে মুখর হ'য়ে উঠলে—
তুমি, বেদজ্ঞানহীন বর্ণসংকর,
যার পিতা ব্রাহ্মণ হ'লেও মাতা বৈশ্যকন্যা?

সঞ্জয়

(শান্ত স্বরে)

মহারাজ, আমি আমার স্বধর্ম থেকে চ্যুত হইনি।
ঐ উক্তি আপনার। আমি আপনারই মুখপাত্র।

ধৃতরাষ্ট্র

ঐ বাজে তূরী, ভেরী, দুন্দুভি।

(অধৈর্যের ভঙ্গি ক'রে)

বিবরণ বলো! বিবরণ বলো!

সঞ্জয়

শল্যের অভিষেক সম্পন্ন। বেরিয়ে পড়লো দুই পক্ষের সৈন্যদল,

সংক্রান্তি

রথী, অশ্বারোহী, পদাতিক,
ব্যূহবন্ধ, জ্যামিতিক,
চতুষ্কোণ, বৃত্তাকার, সূচীমুখ, শঙ্খের মতো আকৃতি,
এগিয়ে চলে ছন্দে, যেন শোভাযাত্রা, কোনো উৎসব —
কিন্তু না! এখন বেগবান — ক্রমশ আরো ত্বরান্বিত —
ঝাঁপিয়ে পড়ে পরস্পরের মধ্যে — উত্তাল —
দুই বিপরীতগামী ঝঞ্ঝার যেন সংঘর্ষ।

ধৃতরাষ্ট্র

আমি শুনতে পাচ্ছি প্রাত্যহিক শব্দ —
ঠিক অন্য দিনের মতো নয় কিন্তু।
এতদিন ছিলো দূরাগত কোনো জলপ্রপাতের মতো গর্জন,
গভীর — অবিরল — প্রবহমান,
যার মধ্যে এক হ'য়ে মিশে যায়
বৃক্ষের উৎপাটন
শিলাখণ্ডের স্খলন
তরঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গের ঘর্ষণ,
আর প্রতিধ্বনি — কন্দর থেকে দূরে কন্দরে প্রতিহত।
কিন্তু আজ শুনি স্বতন্ত্র শব্দ — অনেক — বিচ্ছিন্ন —
অশ্বখুর, রথচক্র, জ্যানির্ঘোষ,
আর হ্রেষাধ্বনি আর বৃংহিতনাদ, আর
তীক্ষ্ন ধাতব ঝঞ্ঝনা।

সঞ্জয়

তীব্র তেমনি, তবু -

আজকের যুদ্ধ অন্য দিনের তুলনায়
লক্ষণীয়ভাবে স্বল্পায়তন।

ধৃতরাষ্ট্র

কোন পক্ষ
ক্ষীণতর মনে হয়?

সঞ্জয়

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ
অযুত শত্রু নিপাত করেছেন। পাণ্ডবের সৈনিকসংখ্যা
সংকুচিত। আর কৌরবপক্ষে
এখনো আছে কাম্বোজসেনা, অন্ধকসেনা,
আর দশ সহস্র সংশপ্তক,
যারা আমরণ যুদ্ধে প্রতিশ্রুত।

ধৃতরাষ্ট্র

শতজীবী হও, সংশপ্তকগণ!

সঞ্জয়

আপনার বাঞ্ছাপূরণের অন্তরায়
শুধু আপনারই পাঁচ ভ্রাতুষ্পুত্র — আর কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গী।

ধৃতরাষ্ট্র

তুমি কি ভুলে যাচ্ছো, সঞ্জয়,

সংক্রান্ত

কুরুবংশের মহত্তম বীর,
যার নির্ভর তার নিজের পুরুষকার—কোনো ধূর্ত হীনজন্মা
কৃষ্ণ নয়—
অতুলনীয় যোদ্ধা, অপ্রতিরোধ্য—

(তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমশ দৃপ্ত)

শরক্ষেপে অর্জুনের মতোই অব্যর্থ,
খড়্গচালনায় সাত্যকির চেয়েও প্রখর,
গদাযুদ্ধে ভীমের চেয়েও দারুণ,
অষ্টাঙ্গ রণবিদ্যায় পারঙ্গম—
অন্যায় নয়, নীতিসম্মত বিদ্যায়—
সেই তেজোবাহন
শত্রুদহন
রণপ্রহরণ
দুর্যোধন এখনো জীবিত!

সঞ্জয়

রণস্থলের কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত
ছুটে চ'লে যাচ্ছেন ভীমসেন।
আমার মনে পড়ছে ভীষণ এক প্রতিজ্ঞা।

ধৃতরাষ্ট্র

রেখে দাও, রেখে দাও ও-সব প্রতিজ্ঞার কথা-
শুধু ডঙ্কানাদ, বাগাড়ম্বর।

দুর্যোধন জীবিত, জয়লক্ষ্মী চঞ্চলা,
কেউ জানে না শেষ পর্যন্ত
কার কণ্ঠে তিনি মাল্যদান করবেন।

সঞ্জয়

ঘূর্ণিত হাতে স্বর্ণমণ্ডিত গদা,
পিঙ্গল চোখে অগ্নিকণা স্ফুরিত,
চণ্ডমূর্তি ধ্বংসপরায়ণ ভীমসেন।

ধৃতরাষ্ট্র

পাষণ্ড ভীম—
অতিভোজী, রক্তপায়ী, আচারভ্রষ্ট,
যার যোগ্য স্থান চণ্ডালবাসিত অরণ্য, যোগ্য নারী রাক্ষসী—
আমি ভেবে পাই না সে কেমন ক'রে হ'তে পারলো
যুধিষ্ঠিরের সহোদর, আর যুধিষ্ঠির
কেমন ক'রে তাকে সহ্য করেন, স্নেহ করেন।

সঞ্জয়

পিতৃত্বে, আর ভ্রাতৃত্বেও
শোণিতবন্ধন অনতিক্রম্য।

ধৃতরাষ্ট্র

উচ্চ রোল! নিনাদ! অস্পষ্ট—
কখনো যেন জয়োল্লাস, কখনো বিক্ষোভ।

সঞ্জয়

অজগরতুল্য আলিঙ্গনে
আবদ্ধ হ'লো মদ্রসেনা আর কাম্বোজবাহিনী।
ছুটে এলো যদুকুলের বীরবৃন্দ, অন্ধকদেশীয় যোদ্ধারা।
এখন সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি, মহারাজ,
যা অনেকবার বলতে হয়েছে আমাকে,
প্রায় একই ভাষায়, বৈচিত্র্যহীন।
ওড়ে ধাতুখণ্ড, ছিন্ন অঙ্গ, প'ড়ে যায়,
জড়িয়ে যায় অশ্বরজ্জু ও অন্ত্রতন্ত্র,
লোষ্ট্র আর নরমুণ্ড যেন নির্ভেদ।
পশু আর মানুষ, উচ্চ আর নীচ বংশ
শত্রু, মিত্র রক্তের স্রোতে নির্ভেদ।
ঘোর যুদ্ধ। তুমুল সংগ্রাম। পঞ্চপাণ্ডব
একসঙ্গে আক্রমণ করলেন শল্যকে।

ধৃতরাষ্ট্র

আঘাত করো, শল্য!
ভগ্নীপুত্র ব'লে নিস্তার দিয়ো না।

সঞ্জয়

দ্রুত রথে
সম্মুখীন হলেন অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা,
পাণ্ডসৈন্যের যমতুল্য দুই বীর।

ধৃতরাষ্ট্র

আর দুর্যোধন? সে?

সঞ্জয়

আরূঢ়
পর্বতাকার হস্তীর পৃষ্ঠে,
অশ্বের বেগে ধাবমান গজেন্দ্র—
আপনার পুত্র, জ্যোতিষ্মান যেন দেবতা,
অস্ত্রে, ক্রোধে, আভরণে উজ্জ্বল—
ঐ ছুটে আসছে শেল, তাঁকে লক্ষ্য ক'রে—
মধ্যপথে দীর্ণ হ'য়ে গেলো—
রৌদ্রে ঝলক তুলছে
আরো অনেক অস্ত্র, তীব্র গতিশীল।
কনকবর্ণ, রজতকান্তি, দীপ্তিশালী—
আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

ধৃতরাষ্ট্র

আমি জানি না কাকে বলে উজ্জ্বল, কাকে কনকবর্ণ।
আমি শুধু স্পর্শ করেছি তোমাদের,
বহু যত্নে, একমনে, বহুদিন ধ'রে
শুধু অঙ্গুলি দিয়ে অধ্যয়ন করেছি
তোমাদের ভঙ্গি, ব্যবহার, ক্ষমতা—
হে সপ্তধাতুর সন্নিপাত, দক্ষ হাতে শিল্পিত,

যজ্ঞবেদীতে উৎসর্গিত
বহ্নিজাত মারণাস্ত্রগণ!
আমি জানি শতঘ্নী কেমন কণ্টকময়, বর্তুল,
শক্তি কেমন নখরযুক্ত, সর্পরূপী,
ভল্ল কেমন তীক্ষ্ণমুখ, ত্রিকোণ,
আর বজ্রবিদারণ গদা — মসৃণ, ভারবান, মারাত্মক,
আমি জানি তোমরা কত সমর্থ, তোমাদের প্রয়োগশাস্ত্র অনেক
শুনেছি —
আমি — শুধু সম্ভবপর বীর, যুদ্ধ করিনি কখনো,
শুধু অন্ধতাদোষে অক্ষম, অন্য কিছুতে নয়।
তাই বলি :
আজ প্রসন্ন হও, বন্ধুগণ। বিনাশের জন্য
বেছে নাও আমাদের যারা শত্রু,
হরণ করো পাণ্ডবের তেজ, আর ধৃতরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তা।
আশ্রয় দাও আমার পুত্র দুর্যোধনকে,
তার সব অপরাধ মার্জনা করো। মনে রেখো
আমার অলব্ধ সব উচ্চাশার সে পরিপূরণ,
আমার ব্যর্থ জীবনের সান্ত্বনা,
প্রজাপালনে পরিশ্রমী, দেবতর্পণে মনোযোগী,
আর তোমাদের প্রতি চিরকাল আস্থাবান।

সঞ্জয়

শল্যের চার অশ্ব ছিন্নাঙ্গ। দুর্যোধন
নিধন করলেন দুই যদুবংশীয় বীর — বভ্রু ও চৌতিকান।
নকুলের হাতে নির্বাপিত হ'লো যুগপৎ

কর্ণপুত্রদের পিতৃশোক, আর জীবন। বিন্ধ হ'লো তোমর—
শল্যের হাতে নিক্ষিপ্ত—
ভীমসেনের বিশাল বক্ষে—প্রচণ্ড।

ধৃতরাষ্ট্র

সাধু, মদ্রপতি, সাধু!

সঞ্জয়

মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠলেন ভীম। অকস্মাৎ,
কানে-কানে ধনুর্গুণ টেনে প্রস্তুত,
শল্যের দিকে ধাবিত হলেন যুধিষ্ঠির।

ধৃতরাষ্ট্র

কী বললে? যুধিষ্ঠির?

সঞ্জয়

তিনি নিক্ষেপ করলেন দশটি বাণ একসঙ্গে—
সব ব্যর্থ। কিন্তু অন্য একটি—
কোনো অনির্ণেয় অখ্যাত হাতে প্রক্ষিপ্ত—
তাঁর স্কন্ধে বিন্ধ হ'লো গভীর। মুঠো থেকে খ'সে পড়লো
ধনু।
সারথি রথের মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

ধৃতরাষ্ট্র

(তাচ্ছিল্য ও স্নেহমিশ্রিত স্বরে)

একটিমাত্র বাণ—তাও পেশীময় স্কন্ধে!
বৎস যুধিষ্ঠির,
মৃদুভাষী, বিনয়নম্র, ধর্মাত্মা,
বনবাসে সম্মত,
বাস্তুহীনতায় সন্তুষ্ট,
পর্যটনে সুখী,
দারিদ্র্যে সহনশীল,
মুনিদের মুখে আখ্যান শুনে অভ্যস্ত,
পত্নীর মুখে ধিক্কার শুনে অভ্যস্ত—
এই যুদ্ধক্ষেত্র তোমার যথাস্থান নয়,
তোমার হাতে অস্ত্র নয় শোভন,
তোমার অঙ্গে আঘাত নয় রুচিসম্মত।
ফিরে যাও
তোমার ক্ষুদ্র ক্ষতের চিকিৎসার জন্য শিবিরে,
বা বিশ্রাম করো
অন্তঃপুরে ধাত্রীসেবিত শয্যায়। নিনাদ আরো প্রখর।

সঞ্জয়

ধাত্রী নয়—যোদ্ধৃপরিবৃত,
যুধিষ্ঠির ফিরে আসছেন রণস্থলে।

ধৃতরাষ্ট্র

আমি বিস্মিত,
এখনো তিনি যুদ্ধের দর্শক হ'তে চান। এত করুণাশীল!

সঞ্জয়

তাঁর ডানদিকে সাত্যকি, বামে ধৃষ্টদ্যুম্ন,
সামনে ভীমসেন, পশ্চাতে অর্জুন।

ধৃতরাষ্ট্র

অতি সুরক্ষিত—
যেন সখীবেষ্টিত রাজকন্যা!

সঞ্জয়

তাঁর রথে
বহুতর অস্ত্রের স্তূপ, তাঁর চক্ষু রোষরক্তিম।

ধৃতরাষ্ট্র

তুমি ভুল দেখছো, সঞ্জয়। যুধিষ্ঠির রুষ্ট হ'তে জানেন না।

সঞ্জয়

'মাতুল, তুমি প্রস্তুত হও!'—মেঘমন্দ্র গর্জন—
'জয় অথবা মৃত্যু—আজ এই আমার প্রতিজ্ঞা!'

ধৃতরাষ্ট্র

ঐ উক্তি—যুধিষ্ঠিরের? তাঁরই কণ্ঠে ঘোষিত?

সঞ্জয়

তাঁরই, প্রভু। আমি যেন এখন চিনতে পারছি না
শান্তশীল ধীরবক্তা যুধিষ্ঠিরকে।
অস্ত্রধারী,
রক্তবর্ণ,
ক্রোধে কম্পিত,
অস্বাভাবিক, বিকৃত তাঁর মূর্তি—
ঐ উত্তোলিত তাঁর বাহু, জ্বলন্ত চোখ শল্যের দিকে নিবদ্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র

না! তুমি যেয়ো না, যুধিষ্ঠির,
শল্যের হাতে অর্পণ কোরো না প্রাণ।
তুমি ভালো, তুমি শ্রেষ্ঠ,
আমার একশত-পঞ্চ পুত্রের মধ্যে তোমার মতো নির্মল কেউ নেই
ফিরে এসো! যুধিষ্ঠির, ফিরে এসো!
তোমার মৃত্যু আমি চাই না।

সঞ্জয়

বাণ প্রাস, পরশু
ধাবিত, বিদ্ধ, উৎপাটিত, বিচূর্ণিত,
এখনো বহু যোদ্ধা, এখনো আরো রক্তপাত—
শল্যের সারথি লুণ্ঠিত,
রথ ছেড়ে মাটিতে—
হাতে খড়্গ, সামনে যুধিষ্ঠির,

আক্রোশে বক্ষোদেশ উত্তাল,
ঝড়ের বেগে শল্য ছুটে যাচ্ছেন।

ধৃতরাষ্ট্র

নিবৃত্ত হও, শল্য।
যুধিষ্ঠির যোদ্ধা নন, তাঁকে জীবিত রাখো।

সঞ্জয়

তিনটি তীক্ষ্ণধার বিশাল ভল্ল
বিদ্যুৎবেগে বিদ্ধ করলো মদ্রপতিকে—
একটি কণ্ঠে, একটি বক্ষে, অন্যটি উদরে।
তাঁর দীর্ণ দেহ থেকে রুধির
উৎসমুখ থেকে জলধারার মতো নিঃসরমান।
তবু তিনি পদপাত করলেন আরো কয়েকবার,
আরো একবার আক্রমণে উদ্যত—
কিন্তু মনে হয় যেন বীর শল্য আর পৃথিবীতে নেই,
শুধু প'ড়ে আছে ভূপৃষ্ঠে
একটি মনুষ্যাকৃতি পঞ্চভূতের পিণ্ড—
ছিন্নভিন্ন, ছিদ্রময়, বোধশক্তিহীন।

ধৃতরাষ্ট্র

(রুদ্ধ স্বরে)

কার হাতে, সঞ্জয়? কার হাতে?

সঞ্জয়

যুধিষ্ঠির

তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র

কে? কোন প্রতিজ্ঞা? কী বলছো তুমি?

সঞ্জয়

আপনার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে, কুরুপতি।
যুধিষ্ঠির অনাহত আছেন। ঐ শুনুন—
পাণ্ডবের হর্ষরোল, কৌরবের হাহাকার
একসঙ্গে উত্থিত হ'য়ে— অকস্মাৎ মিলিয়ে গেলো।
শোক অথবা উল্লাসের আর সময় নেই এখন,
আজ শেষ দিন, মীমাংসা এখনো অনিশ্চিত।
আর দীর্ঘায়িত রণপরিশ্রমের পরে
অনুভূতির শক্তিও প্রায় নিঃশেষ।

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

ধৃতরাষ্ট্র

কিন্তু আমার অন্য কিছু নেই—
শুধু অনুভূতি—বেদনা—বৃদ্ধের বিলাপ।
আমি শল্যের জন্য বিলাপ করি না, সঞ্জয়।

ক্ষত্রিয়, শত্রুনাশ ক'রে নিজের প্রাণ দিয়েছেন—
তাঁর গতি হবে বৈকুণ্ঠে। কিন্তু যুধিষ্ঠির—
অসূয়াহীন, মৃদুভাষী, নির্লোভ,
আমরা যাঁর কথা মান্য করলে যুদ্ধ কখনো হ'তো না—
তিনি চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট, নিজেই নিজের বিরুদ্ধাচারী—
সঞ্জয়, এও কি সম্ভব হ'লো আজ?

সঞ্জয়

প্রভু, স্মরণ করুন,
সেই অতি বিশ্বস্ত ধর্মপরায়ণ পুরুষ
দ্রোণাচার্যের শক্তিনাশ করেছিলেন—মিথ্যাভাষণে।

ধৃতরাষ্ট্র

'অশ্বত্থামা হত—ইতি মাতঙ্গ।'
দাসপুত্র কুটিল কৃষ্ণের পরামর্শ!
কিন্তু কোথায় সেই অর্ধ-সত্য, অতি ক্ষুদ্র মিথ্যা,
অনিচ্ছায় অস্পষ্ট স্বরে অর্ধোচ্চারিত—
আর কোথায়
অস্ত্রাঘাতে হত্যা, নিজের হাতে হত্যা,
যে-কোনো অন্যের মতো, যে-কোনো সৈন্যের মতো,
আততায়ী ভীম কিংবা সাত্যকির মতো,
এতকাল পরে—এই অন্তিম দিনে—
সত্যি কি প্রয়োজন ছিলো? অন্য কেউ পারতো না?

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

না—কিছু নয়। আমি ভুল বুঝেছি।
আমি চিনি তোমাকে, যুধিষ্ঠির,
তোমার পক্ষে অপলাপ সম্ভব, বিচ্যুতি নয়।
এই প্রথম তোমার হাতে হত্যা—কিন্তু অন্যায় যুদ্ধে নয়,
এই প্রথম কোনো কৌরবনেতা বিনা মিথ্যায় নিহত।
কিন্তু তবু—
হয়তো এখনই তুমি ধিক্কার দিচ্ছো নিজেকে,
নারীর মতো ক্রন্দনে জড়িতস্বর।
হয়তো আজ সূর্যাস্তের আগেই তুমি
অনুশোচনায়, ক্ষমাপ্রার্থনায় বাষ্পাকুল,
আমার পায়ে প'ড়ে বলবে, 'অনুমতি দিন, আমরা আবার বনবাসে
যাই—
আমি রাজ্যসুখ চাই না, দুর্যোধন একচ্ছত্র হোন।'
শব্দ আবার উতরোল।

সঞ্জয়

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ,
সময় সংকীর্ণ হ'য়ে এলো। শল্যবধের পরে কিছুক্ষণ
যেন হতোদ্যম ছিলো কৌরবসেনা।
কিন্তু দুর্যোধন
যেন মূর্তিমান শেষ অবতার কল্কি,
গদা, খড়্গ, ধনুর্বাণ বহন ক'রে,
অগ্নিবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরে-ঘুরে
জাগিয়ে তুলছেন নূতন ক'রে উদ্দীপনা—
চরম দ্বন্দ্ব কৌরবে আর পাণ্ডবে।

ধৃতরাষ্ট্র

সংক্রামিত

(অসহিষ্ণু স্বরে)

বিবরণ! বিবরণ!

সঞ্জয়

আমাকে মুহূর্তকাল সময় দিন, প্রভু।
এত দ্রুত ঘটনা, এত চঞ্চল আবর্ত—
আমার দৃষ্টি প্রতিযোগী হ'তে পারছে না।

ধৃতরাষ্ট্র

ভীম, অর্জুন, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা—
এরাও লক্ষণীয় নয়?

সঞ্জয়

আপনার পুত্রের মতোই
ইতস্তত ঘূর্ণমান সব নেতারা.
দৃশ্য—কখনো অদৃশ্য—তাঁদের অস্ত্রপাত বিরতিহীন,
যেন ভাদ্রের শেষ বর্ষণধারা
প্রতি মুহূর্তে প্রবলতর, বর্ধিতবেগ,
বিদ্যুতে ও বজ্রপাতে ভয়ংকর,
যেন একই সঙ্গে দাবানল আর বন্যা।
ঐ জ্বলে উঠলো আগুন
অর্জুনের গাণ্ডীব থেকে, লক্ষ শিখায় লেলিহান,

আর, যেন অদম্য কোনো আকর্ষণে
ঝাঁকে-ঝাঁকে পতঙ্গের মতো স্বেচ্ছায় বা অসহায়ভাবে
দগ্ধ হচ্ছে কাম্বোজসেনা, সৌবীরসেনা,
আর অন্ধক আর সংশপ্তকবাহিনী।
অন্য দিকে, প্লাবনের মতো
দুর্যোধনের বিস্ফারিত বিক্রম
স্খলমান পল্লীর মতো ভাসিয়ে নিচ্ছে
পাণ্ডবপক্ষের সম্বল, যারা মৎস্য মগধ চেদিরাজ্য থেকে এসেছিলো
কিন্তু কেউ আর নিজের দেশে ফিরবে না।
আতঙ্ক, দুই দিকে আতঙ্ক :
দুই পক্ষের যোদ্ধারা—
ভারতবর্ষের সন্তান, ঐরাবতবর্ষের সন্তান—
ব্যূহভ্রষ্ট, ছত্রভঙ্গ, বিশৃঙ্খল,
আর্ত, বিস্রস্ত জনতা—
হননশীল
পলায়নশীল
মরণশীল—
মৃত্যু, অবশেষে জয়ী শুধু মৃত্যু,
মহাকালের খাদ্য আজ প্রচুর—
এই সুন্দর অগ্রহায়ণে
ক্ষেত্র থেকে গুচ্ছ-গুচ্ছ পরিপক্ক ধান্যের মতো
দেহ থেকে উৎপাটিত জীবাত্মা –
গণনার অতীত, বেদনার অতীত, বিমিশ্র—
তারা কথা বলতো ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায়, এখন একই ভাবে স্তব্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র

আক্ষেপ কোরো না, সঞ্জয়। কালগ্রাস অলঙ্ঘনীয়।
প'ড়ে যায় বংশপরম্পর প্রাণীরা,
আয়ু ক্ষুদ্র, আশা বিশ্বাসঘাতিনী--
মানুষ তবু চেষ্টাপরায়ণ।

সঞ্জয়

ভুক্তাবশেষ নিঃশেষ হ'য়ে এলো।
এর পরে কে থাকবে এই দেশে, কোন পিতার আশ্রয় পাবে শিশুরা?

ধৃতরাষ্ট্র

পিতা যেমন সন্তানের
রাজা তেমনি সর্বজনের প্রতিপালক।
দুর্যোধন ফিরিয়ে আনবে রাজ্যশ্রী,
জয়শ্রী যদি তার দিকে আকৃষ্ট হন।

সঞ্জয়

শবের স্তূপ,
মেদ মাংস রক্তে মেশা কর্দম,
পুঞ্জীভূত অশ্বমল, বিষ্ঠা,
আর কৃমি—শবমাংসভুক, বিষ্ঠাজাত,
আর রৌদ্র, এত ক্লেদ শোষণ ক'রেও স্বাভাবিকভাবে অম্লান—
এরই মধ্য দিয়ে
একা দুর্যোধন চলেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র

(চকিত)

দুর্যোধন একা?
কেউ পার্শ্বরক্ষী নেই? সশস্ত্র?

সঞ্জয়

একা তিনি। একটিমাত্র অস্ত্র তাঁর হাতে—
বিখ্যাত লৌহময় গদা।

ধৃতরাষ্ট্র

ভীম গদা
যা সে অভ্যাস করেছে প্রতিদিন, তেরো বছর ধ'রে,
ভীমসেনের উদ্দেশে। গজপৃষ্ঠে, না অশ্বারূঢ়?

সঞ্জয়

পায়ে হেঁটে পূর্বদিকে চলেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র

(আশঙ্কা ও অবিশ্বাস মিশ্রিত স্বরে)

পায়ে হেঁটে? দুর্যোধন?

সঞ্জয়

বিস্রস্ত তাঁর কেশদাম, দৃষ্টি ভূমিতে।
মনে হয় তিনি ক্লান্ত, চিন্তাকুল।

ধৃতরাষ্ট্র

(তীব্র স্বরে)

মিথ্যা! তুমি মিথ্যা বলছো, সঞ্জয়!
তুমি কি জানো না দুর্যোধন
আঘাতে আরো উগ্র, ব্যাঘাতে আরো দুর্দম—
কোনো চীরধারী নাস্তিক পরিব্রাজক নয়—
প্রভুত্বকামী অক্লিষ্টকর্মা ক্ষত্রিয়?
জানো না,
তার মাথা নত হয় শুধু দেবসদনে, মাতৃচরণে,
অন্যত্র কখনোই নয়?

সঞ্জয়

আমার জিহ্বাকে মার্জনা করুন, প্রভু—
আমি উদ্ভাবক নই, বিবৃতিকার।
আমার চক্ষু আমার সাক্ষী। আকাশে সূর্যালোক সাক্ষী।
আর নেপথ্যে যদি দেবগণ থাকেন, তাঁরাও।
ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি যদি রাজা দুর্যোধনকে না-চিনতাম
তাহ'লে ঐ নতশির পদাতিক যাত্রীকে
আমার মনে হ'তো কোনো ক্লান্ত
ক্ষত-বিক্ষত সামান্য সৈনিক,
অথবা যে-কেউ, যে-কোনো একজন
দেহে-মনে বেদনাসম্পন্ন মানুষ—
পরাস্ত,
আশাহত,
দুঃখী।

ধৃতরাষ্ট্র

(হঠাৎ ভয় পেয়ে)

বোলো না—
বোলো না দুর্যোধন রণত্যাগী, পরাঙ্মুখ!

সঞ্জয়

তিনি পেরিয়ে গেলেন
কুরুক্ষেত্রের প্রান্ত, পৌঁছলেন
সেই ছায়াচ্ছন্ন বনস্থলে, যার মধ্যভাগে দ্বৈপায়ন হ্রদ,
শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্মল,
আরোগ্যশালায় শয্যার মতো আমন্ত্রণকারী!

ধৃতরাষ্ট্র

(আশ্বস্ত)

তাহ'লে রণত্যাগ নয়—নূতন আয়োজন!
স্নান, ধ্যান, মন্ত্রজপ ক'রে
শেষ যুদ্ধের জন্য—সিদ্ধির জন্য প্রস্তুতি।
আমি শুনেছি দ্বৈপায়ন হ্রদের
জল অতি পবিত্র—শক্তিবর্ধক, ইষ্টকারী।

সঞ্জয়

আপনার অনুমান যথার্থ, মহারাজ।
রণবেশ ত্যক্ত,
দীর্ঘকায়, দীর্ঘবাহু, বিরাটবক্ষ,

সিংহের মতো কটি, স্তম্ভের মতো উরুদ্বয়,
—রমণীর চোখে বিমোহন, পুরুষের চোখে ঈর্ষণীয়—
শুধু ক্ষতচিহ্নে অলংকৃত,
শুধু কেশগুচ্ছ কিরীটধারী,
নামলেন তিনি জলে, মন্থর পায়ে
যেন পুষ্করবাসী দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত। তাঁর মাথায়
ঝ'রে পড়লো তীরবর্তী দেবদারু থেকে পল্লব
দূর্বার মতো, যেন আশীর্বাদে। আর জল
তাঁকে ঘিরে-ঘিরে স্নাত ক'রে দিলো, সস্নেহে।
আমার মনে হয় জলদেবী আর বনদেবীরা
যুক্ত হয়েছেন শরণার্থীর পরিচর্যায়।
আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি
তাঁদেব হাতের স্পর্শ—কল্যাণময়, কোমল,
যা ধুয়ে দেয় গ্লানি, হরণ করে ম্লানিমা;
যেন প্রায় শুনতে পাচ্ছি
তাঁদের তরল অথবা মর্মরস্বরে সান্ত্বনা।
দুর্যোধন আকণ্ঠ জলে দাঁড়িয়ে,
তাঁর দেহ বিশ্রান্ত, শুধু ঠোঁট নড়ছে—
যেন মন্ত্রজপে নিবিষ্ট।

ধৃতরাষ্ট্র

ভাগ্যবিধাতা, মরুৎবর্গ, আদিত্যগণ—
আমার পুত্রের প্রতি অনুকূল হও!
হঠাৎ ঐ কোলাহল কেন?

সঞ্জয়

বনভূমি মর্দন ক'রে
ছুটে এলো একদল সৈন্য, ঘিরে ফেললো দ্বৈপায়ন হ্রদ;
যেমন মৃগয়াচারী পুরুষবৃন্দ
পরিবৃত করে সিংহকে, কোনো শান্ত বনপথে, অকস্মাৎ
তোলে চীৎকার, ঢক্কানাদ, ঘণ্টাধ্বনি, যাতে শার্দূলশ্রেষ্ঠ
গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত, উত্তেজিত, ঝাঁপিয়ে পড়ে
উদ্যত অস্ত্রধারীদের মধ্যে—মৃত্যুর মুখে—
তেমনি এরা উৎসাহিত, উন্মুখর, কর্কশ,
তেমনি এদের অট্টরোল প্রতিধ্বনিত—
'পেয়েছি! সন্ধান পেয়েছি দুরাত্মার! ঐ লুকিয়ে আছে
জলের মধ্যে!'

ধৃতরাষ্ট্র

(তীব্র উচ্চ স্বরে)

মিথ্যাবাদী মূর্খেরা—শোনো!
দুর্যোধন লুকিয়ে থাকে না, দুর্যোধন ভীত হ'তে শেখেনি।
—সঞ্জয়, সে কি এখনো নিষ্ক্রিয়?

সঞ্জয়

উত্তোলিত হ'লো
মুদ্গরতুল্য দুই স্কন্ধ, জলবিন্দুর লেখনে আরো চিক্কণ।
তিনি দৃষ্টিপাত করলেন চারদিকে,
দেখলেন তাঁর সম্মুখীন তীরে দণ্ডায়মান
অনিবার্য সেই ছয়জন।

ধৃতরাষ্ট্র

ছয়ের মধ্যে এক শুধু বিবেচ্য—
যদি না কুন্তী-মাদ্রীর গর্ভজাত পঞ্চক
আরো একবার ধর্মাধর্ম ভুলে
এক মধুবক্তা ক্রূরকর্মার প্ররোচনায়
একসঙ্গে আক্রমণ করে একজনকে।
কিন্তু না—
যুধিষ্ঠির উপস্থিত আছেন। যুধিষ্ঠির সাধু।

সঞ্জয়

বহু কণ্ঠে ঘোষিত হ'লো আহ্বান :
'দুর্যোধন, উঠে এসো। ভীরুর মতো প্রচ্ছন্ন থেকো না।
উঠে এসো! বর্ম প'রে নাও। অস্ত্র বেছে নাও।
বেছে নাও পঞ্চপাণ্ডবের যে-কোনো একজনকে।
আমরা যুদ্ধ চাই।'

ধৃতরাষ্ট্র

যে-কোনো একজনকে!
কী নির্বোধ উক্তি! ওরা কি চায় পঞ্চভ্রাতাই বিনষ্ট হোক—
যুধিষ্ঠিরও? কে আছে ওদের মধ্যে—একজন ছাড়া—
যাকে বলা যায় দ্বৈত যুদ্ধে আমার পুত্রের—
সমকক্ষ নয়—অন্ততপক্ষে তুলনীয়?
কিন্তু আমি জানি আত্মাভিমানী দুর্যোধন
তৃপ্ত হবে না দুর্বলের সঙ্গে যুদ্ধে—

বেছে নেবে প্রবলতম শত্রু, মহত্তম জয়।
ভীমসেন, তুমি হত হ'লে!

সঞ্জয়

দুর্যোধন উচ্চারণ করলেন
কয়েকটি ধীর গম্ভীর সুচিন্তিত বাক্য :
'ভ্রাতৃগণ, শত্রুবৃন্দ, তোমাদের আহ্বান
আমি গ্রহণ করছি সাদরে, সানন্দে।
কিন্তু এ-মুহূর্তে
আমি ঘোর রণশ্রমে অবসন্ন, আছি রত দেবার্চনায়,
তাই প্রার্থনা করি—
এই শান্ত জলে শুশ্রূষার জন্য,
আমার মন্ত্রজপ সমাপনের জন্য
তোমাদের কাছে—কিছুক্ষণ সময়, স্বল্প অবকাশ।'

ধৃতরাষ্ট্র

বীরোচিত বাক্য—সুভদ্র, মর্মস্পর্শী।
ঐ অশ্লীল অট্টহাসি কার?

সঞ্জয়

তীরে-তীরে ধিক্কার দিচ্ছে পাণ্ডবসেনা।
পবিত্র দ্বৈপায়নের জলে লোষ্ট্রের মতো
নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, দম্ভোক্তি।
'দুর্যোধন, তুমি কি তবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র নও?

না কি তুমি মস্তকহীন নপুংসক?
তবে বিলম্ব কেন? কেন কয়েক মুহূর্তের আয়ুভিক্ষা?'

ধৃতরাষ্ট্র

(গর্জন ক'রে)

উত্তর দাও, দুর্যোধন—বাক্যে নয়, অস্ত্রেও নয়,
রুদ্ধ করো মুষ্টির চাপে কণ্ঠনালী,
হাতে টেনে ছিন্ন করো পাপজিহ্বা!

সঞ্জয়

অঙ্কুশ যেমন গজরাজের অসহ্য,
উত্তম অশ্ব কশাঘাতে অস্থির,
শল্যবিদ্ধ গণ্ডার যেমন দুর্মদ—
তেমনি
হ্রদের জল মন্থন ক'রে,
তরুপল্লবে কম্পন তুলে,
কাকের কণ্ঠে শঙ্খের মতো নিনাদ জাগিয়ে
তীরে উঠলেন
সিক্ত, সংক্ষুব্ধ, নিশ্বসিত—
আপনার পুত্র দুর্যোধন।
দাঁড়ালেন তিনি বিবসন, নগ্নতায় দেদীপ্যমান—
ক্লান্তি অপগত, দৃপ্তশির—
প্রতি অঙ্গে স্বাস্থ্যের জ্যোতি, শক্তির বিকিরণ।
তাঁকে দেখে সব কণ্ঠ মূক হ'লো, সব চক্ষু নিষ্পলক—

যেন বিস্ময়াবিষ্ট।
পঞ্চপাণ্ডবের চোখে-মুখেও মুগ্ধতা
যতক্ষণ ধ'রে তিনি
ধারণ করলেন আবার তাঁর রণসজ্জা—কবচ, অঙ্গদ, শিরস্ত্রাণ,
আর কুণ্ডল, আর রত্নজড়িত কটিবন্ধ, আজানুদীর্ঘ পাদুকা।
শোভমান
যেন বর্বরবিজয়ী পুরন্দর,
বা অসুরহন্তা দেবসেনাপতি,
চক্ষু থেকে
স্ফুলিঙ্গের মতো তাচ্ছিল্যকণা ছড়াতে-ছড়াতে
অগ্নির মতো অগ্রসর হলেন দুর্যোধন। কিন্তু হঠাৎ
তাঁর সমবয়সী বাল্যবন্ধুর দিকে তাকিয়ে
তাঁর মুখশ্রী যেন কোমল হ'লো—মুহূর্তের জন্য।
বিষণ্ন স্বরে বললেন, 'ভীমসেন,
ছেলেবেলায় আমরা ছিলাম খেলার সঙ্গী,
একই পিতার গৃহে পালিত, একই আচার্যের শিষ্য,
একই অঙ্গনে ব্যায়াম, একই নদীতে সন্তরণ,
মল্লযুদ্ধে, অশ্বচালনায় প্রতিযোগী।
সে-সব দিন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে,
শুধু পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশিষ্ট।
তুমি আর আমি একই দিনে জন্মেছিলাম,
কিন্তু মৃত্যু হবে ভিন্ন-ভিন্ন দিনে।
আজ—একজনের আসন্ন।'
ক্ষিপ্র উত্তর দিলেন ভীম:—'তোমার!
আমি তোমার বন্ধু নই—কৃতান্ত!'

ধৃতরাষ্ট্র

সতর্ক হও, পুত্র! বাল্যস্মৃতি শক্তির অপহারক!

সঞ্জয়

আপনি আশ্বস্ত হোন, মহারাজ। তিনি উপেক্ষা করেছিলেন
ইতরের দুর্বাক্য, ব্যাঘ্র যেমন শৃগালের রবে চঞ্চল হয় না,
কিন্তু ভীমসেনের অশ্রদ্ধার উত্তরে
তাঁর কণ্ঠ হ'লো হুংকৃত, রুদ্ধ রোষ দ্বিগুণ বেগে জ্বলন্ত,
সর্বাঙ্গ রণস্পৃহায় কম্পমান।

ধৃতরাষ্ট্র

আর ভীমসেন?
সে কি এগিয়ে আসছে মৃত্যুর মুখে?

সঞ্জয়

বনপ্রান্তে পরিচ্ছন্ন ভূমিতে
দাঁড়ালেন মুখোমুখি দুই মহাবীর।
চক্ষু ঘূর্ণিত
নাসারন্ধ্র স্ফুরিত
ওষ্ঠপ্রান্ত ফেনিল,
দু-জনের হাতেই উত্তোলিত গদা, দু-জনেই রুদ্রমূর্তি।
কিন্তু যুধিষ্ঠির আদেশ দিলেন :
'অপেক্ষা করো, ভ্রাতৃদ্বয়,
দুর্যোধন তাঁর মন্ত্রজপ শেষ করুন,

আমিও, এই শেষ যুদ্ধের পূর্বক্ষণে,
তর্পণ করি পিতৃগণের, দেবগণের।’

ধৃতরাষ্ট্র

দেবগণ, এবার তোমাদের পরীক্ষা!

[দ্রুত বেগে গান্ধারীর প্রবেশ।]

গান্ধারী

(প্রবেশ করতে-করতে তীব্র স্বরে)

দেবগণ প্রসন্ন এতদিনে। তোমার পাপিষ্ঠ পুত্র মৃত।
উৎসব করো, মহারাজ! আনন্দিত হও!

ধৃতরাষ্ট্র

অন্ধের শ্রুতিশক্তি প্রখর,
তবু ঐ চীৎকার আমি চিনতে পারছি না।
মনে হয় আমার প্রিয়তমা পত্নীর
বাচনভঙ্গির বীভৎস কোনো অনুকরণ,
কোনো পৈশাচিক প্রাকৃত* ভাষায় দেবনিন্দা।
কে, সঞ্জয়? কার কণ্ঠস্বর?

সঞ্জয়

মহারাজ, দেবী গান্ধারী উপস্থিত।
লুণ্ঠিত কেশ, বেশবাস বিস্রস্ত,

তাঁর আয়ত নেত্রে অনলস্পৃষ্ট অশ্রুবেগ।*

গান্ধারী

আনন্দাশ্রু, সঞ্জয়, আনন্দে আমি উদ্বেল।
আজ ধর্মের জয়! আজ সত্যের জয়!

ধৃতরাষ্ট্র

মনস্বিনী ধৈর্যশালিনী গান্ধারী—
শোকে আজ উন্মাদিনী তিনিও।

গান্ধারী

উন্মাদ নই—এক ধর্মহীন পুরুষের সহধর্মিণী,
এক নরাধম পুত্রের আমি মাতা।
কিন্তু সে আর নেই, ধৃতরাষ্ট্র আজ নির্বংশ,
ধরিত্রী পাপমুক্ত—
উৎসবের আদেশ দাও, মহারাজ!

ধৃতরাষ্ট্র

হায়, চৈতন্যহীনা!

সঞ্জয়

দেবী, আপনার পুত্র জীবিত, স্বস্থ। এ-মুহূর্তে
ভীমের সঙ্গে দ্বৈত যুদ্ধে উদ্যোগী। আমাকে তার বিবরণ
বলতে হবে।

* এই নাটকে গান্ধারীর চক্ষু অনাবৃতরূপে কল্পিত হয়েছে।

আমার মিনতি :
আপনি এখানে থাকবেন না। আপনি অন্তঃপুরে যান।

গান্ধারী

অদূরে মৃত্যু—এখনই সে মৃতের মধ্যে গণ্য।
সঞ্জয়, আমি তোমার মতো দিব্যদৃষ্টি পাইনি,
তবু সব জানি, জেনেছি বহুকাল ধ'রে,
দেখেছি সব—যা ঘটছে এখন এই মুহূর্তে
আর তারই সঙ্গে শৃঙ্খলিত অন্য সব—
অতীত, যা লুপ্ত হয়নি এখনো,
ভবিষ্যৎ, যা রচিত হচ্ছে এখনই এই মুহূর্তে।
সেই যন্ত্রণা আমার—দিনের পর দিন—
দিনের পর দিন অনুচ্চারণীয় আতঙ্ক—
আমি, এক নারী, নারীত্ব যার নিষ্ফল,
এক পত্নী, পতি যার মতিচ্ছন্ন,
এক রাজ্ঞী, রাজত্ব যার মর্মপীড়া,
এক মাতা, মাতৃত্ব যার অভিশাপ—
ধর্ম ছাড়া কোথাও যার আশ্রয় নেই,
সত্য ছাড়া কোথাও নেই নির্ভর।
তুমি নির্ভয় হও, সঞ্জয়,
কোনো নূতন বার্তা তুমি আমাকে শোনাতে পারবে না।
আমিও চাই তোমার মুখে শুনতে
কেমন ক'রে অবশেষে উচ্ছিন্ন হ'লো
এই ধ্বংসের মূল, সর্বনাশের আকর,

সংক্রান্তি

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়তম পুত্র,
ক্ষুদ্রচেতা, ঈর্ষাপরায়ণ, পরস্বাপহারী দুর্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র

পরাক্রমশালী, স্বনির্ভর, কর্মিষ্ঠ দুর্যোধন—
সর্বান্তঃকরণে রাজা, পরিপূর্ণ ক্ষত্রিয়,
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যা হ'তে পারেনি, তা-ই।

গান্ধারী

মহারাজ, তোমার চক্ষু দৃষ্টিহীন ব'লে অন্ধ নও তুমি,
তুমি প্রজ্ঞাহীন ব'লেই দৃষ্টিহীন।
অথবা তুমি সজ্ঞান, তবু ভ্রান্ত,
বুদ্ধি আর ভ্রান্তির মধ্যে চিরকাল দোলায়মান—
কিন্তু ভ্রান্তি তোমার বরণীয়, তাই স্বেচ্ছায় তুমি অন্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র

(অসহিষ্ণু স্বরে)

সরল বাক্য—স্বল্প!

গান্ধারী

স্বল্পই যথেষ্ট।

শুধু স্মরণ করো :
দ্বিতীয় দ্যূতসভার ফলাফল।

ধৃতরাষ্ট্র

বলতে চাও সেজন্য দায়ী—
আমি, কিংবা পুত্র দুর্যোধন?
যুধিষ্ঠির নিজের দোষে নিঃস্ব হয়েছিলেন,
তাঁর ছিদ্র ছিলো দ্যূতপ্রিয়তা।

গান্ধারী

আর প্রায়শ্চিত্ত ছিলো বনবাস।
কিন্তু তোমার ছিদ্র আরো মারাত্মক,
তোমার পুত্রস্নেহ অচিকিৎস্য।

ধৃতরাষ্ট্র

পুত্রস্নেহ কি অপরাধ? না, আদিপিতার বিধান?

গান্ধারী

কিন্তু পুত্র যদি তোমার প্রিয়
তবে হননলিপ্ত জতুগৃহের পরেও,
প্রবঞ্চক দ্যূতক্ষেপণের পরেও
তাকে ব্যাকুল হাতে আঁকড়ে ছিলে কেন, মহারাজ?

ধৃতরাষ্ট্র

কে নয় প্রবঞ্চক, গান্ধারী? স্বয়ং ইন্দ্র
ছদ্মবেশে পরস্ত্রীভোগে লিপ্ত হন।
আর তাঁর সুযোগ্য পুত্র অর্জুন

তিন শূরশ্রেষ্ঠকে নিপাতিত করলো
কপট যুদ্ধে — নির্লজ্জ!

গান্ধারী

যুদ্ধ অন্যায়, যুদ্ধ নিবারণীয়।
কিন্তু একবার আরম্ভ হ'লে
পাপ থেকে জ'বলে ওঠে পাপ,
ছড়িয়ে পড়ে হিংসা থেকে প্রতিহিংসা,
চিত্তভ্রংশ থেকে চিত্তভ্রংশ—
অপরাধহীন কেউ থাকে না।
কিন্তু কেন যুদ্ধ? কেন এই পরিকীর্ণ সন্তাপ?
স্বামী, স্মরণ করো,
তোমার সতী পুত্রবধূর ক্রন্দনরোল, যা স্বকর্ণে শুনেও নিষ্ক্রিয়
ছিলে তুমি,
আর তোমার পৌরজনের বেদনা, যাতে অংশ ছিলো তোমারও,
তোমার সুহৃদবর্গের সদুপদেশ, যা নিষ্ফল হ'লো
একজনের জন্য।
স্মরণ করো, কে
নির্জিত করেছিলো পাঞ্চালীকে—সভাস্থলে, গুরুজনের
চোখের সামনে,
কে চীৎকার ক'রে বলেছিলো, 'বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমি দেবো না।'
আর কোন পিতা তার পরেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন—
বিবেকদুঃখী, তবু নিশ্চেষ্ট।
তখনও সময় ছিলো, মহারাজ, তখনও সম্ভব ছিলো—
কেন উপেক্ষা করলে

তোমার ভ্রাতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা—দাসীপুত্র মহাত্মা সেই বিদুর,
যিনি ভীষ্মের মতোই কুরুবংশের বন্ধু?
কেন কর্ণপাত করলে না
শতপুত্রের জননী, শতগুণে শঙ্কিতা,
তোমার হিতৈষিণী প্রণয়িনী পত্নীর ভর্ৎসনায়—প্রার্থনায়?
আর এখন, এই শেষ মুহূর্তে—
যাকে স্নেহশীল তুমি পরিত্যাগ ক'রে বাঁচালে না
নির্মম হ'য়ে আশ্রয় দিলে না,
দুঃখ দিয়ে আশীর্বাদ করলে না,
ঠেলে দিলে
ধর্ম থেকে স্খলিত ক'রে ধ্বংসের মুখে—
এখন ভাবছো কোনো দেবতা তাকে রক্ষা করবেন?
মূঢ় পিতা, এখনো তুমি অন্ধ!

ধৃতরাষ্ট্র

(ক্ষণকাল নীরবতার পরে)

গান্ধারকন্যা, আমার সন্দেহ
তোমার রক্তে আছে সেই যবনকুলের* মিশ্রণ,
যাদের ইতিহাসে কীর্তিত হয়, শুনেছি,
অমানুষিক নৃশংসতা, আর্যাবর্তে অবিশ্বাস্য :
পত্নীর হাতে পতিহত্যা, পিতার হাতে কন্যার,
পুত্রের হাতে মাতার, মাতার হাতে সন্তানের।
নয়তো কেন শুনলাম না

* এখানে 'যবন' শব্দের অর্থ : গ্রীক।

তোমার মুখে, এই সংকটকালে, অন্তত একবার
তোমার পুত্রের জয়লাভের জন্য প্রার্থনা?

গান্ধারী

আমি প্রার্থনা করেছি অবিরল তার জয়ের জন্য।
সে বোঝেনি—কিন্তু তুমি জানো না?

ধৃতরাষ্ট্র

তার জয়ের জন্য?

গান্ধারী

আমি চেয়েছি সে জয় করুক—নিজেকে।
তার যুদ্ধ হোক সেই সব শত্রুর সঙ্গে,
যা তারই মধ্যে ভুজঙ্গের মতো গর্জমান।
এ-ই আমার প্রার্থনা ছিলো—প্রতিদিন। কিন্তু এখন
বিষাক্ত দাঁত বিদ্ধ হয়েছে, মহারাজ,
আর সময় নেই।

ধৃতরাষ্ট্র

গান্ধারী,
আমি তো শুধু জেনেছি তার কেশের স্পর্শ,
তার গাত্রলিপ্ত চন্দনের সুঘ্রাণ,
তার স্নাত দেহের শীতলতা, ভূষণমণির কাঠিন্য,

আর পায়ের শব্দ, আর কণ্ঠস্বর।
কিন্তু তুমি তাকে দেখেছো।
দেখেছো তাকে শিশু, দিনে-দিনে তোমারই যত্নে বর্ধিত
দেখেছো তার কিশোরকান্তি, গরীয়ান যৌবন।
তোমার সেই পুত্র
আজ দাঁড়িয়ে আছে এমন এক প্রান্তে,
যার একদিকে বিজয়লক্ষ্মী, অন্য দিকে অন্ধকার।
আর তবু
তুমি কি তোমার ধর্মের হিম চূড়া থেকে নেমে আসবে না,
কথা বলবে না জননীর কণ্ঠে—একবার?
গান্ধারী, তোমার কি হৃদয় নেই?

গান্ধারী

হৃদয়, মহারাজ? আমার হৃদয় এক শবাচ্ছন্ন শ্মশান,
যেখানে আমি কিঞ্চিৎ স্থান বাঁচিয়ে রেখেছি এখনো,
অতি কষ্টে, আরো একজনের জন্য।

[নেপথ্যে শঙ্খনাদ।]

ধৃতরাষ্ট্র

জয়ী হও, পুত্র!

গান্ধারী

জয় হোক সত্যের।

সঞ্জয়, বলো।

সঞ্জয়

সূর্য নামে পশ্চিমে,
শান্ত রৌদ্রে পরিপ্লুত পৃথিবী।
মনে হয় যেন আকাশ আর মৃত্তিকা,
নির্নিমেষে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে
নিঃশব্দ প্রণয়ভাষণে মগ্ন।

ধৃতরাষ্ট্র

আর যোদ্ধারা?

সঞ্জয়

তাঁরাও নির্নিমেষ, মহারাজ।
কিন্তু ভঙ্গিতে শুধু হিংস্রতা,
দেহ শুধু পরিস্ফীত পেশীপুঞ্জ—
যেন নয় আর দুঃখভোগী রক্তমাংস, বেদনাশীল আত্মা—
দৃষ্টিপাতে হত্যা ছাড়া কিছু নেই।

গান্ধারী

(হঠাৎ আর্ত স্বরে)

নিবৃত্ত করো, মহারাজ—
এখনো নিবৃত্ত করো! যুধিষ্ঠিরকে ফিরিয়ে দাও রাজত্ব,
তোমার পুত্রকে দাও নবজীবন।

ধৃতরাষ্ট্র

(সরোষে)

রসনা রুদ্ধ রাখো, নারী, বা অন্তর্হিত হও।
তোমার অসার বাক্য আমার অসহ্য!

সঞ্জয়

দেবী, আমার বার্তা আপনার শ্রবণের যোগ্য হবে না।
আমি আরো একবার মিনতি করি : আপনি অন্তঃপুরে

গান্ধারী

কোথায় সেই অন্তঃপুর, যা বেদনারাজ্যের বহির্ভূত?
পৃথিবীতে কোথায় সেই স্থান, যা ক্রন্দনহীন?

ধৃতরাষ্ট্র

(অসহিষ্ণু স্বরে)

বিবরণ, সঞ্জয়, বিবরণ!

সঞ্জয়

তাঁরা আক্রমণ করলেন পরস্পরকে
যেন ক্ষিপ্ত দুই বৃষ,
বা মদস্রাবী দুই হস্তী,

বা যুগল সিংহ — একই সিংহীর জন্য কামোন্মত্ত-
তর্জনে
গর্জনে
আস্ফালনে
দন্তঘর্ষণে
অতি ভীষণ — দুর্দান্ত — রোমহর্ষণ।
বিচিত্র
তাদের গতির ভঙ্গি, দেহের ঘূর্ণন, রণকৌশল,
বামাবর্ত, দক্ষিণাবর্ত, উড্ডীন, অবডীন,
সম্মুখীন, বঙ্কিম, ও তির্যক :
প্রচণ্ড
গদার শব্দ, বেগের শব্দ, পায়ের শব্দ,
ঝঞ্ঝার মতো নিশ্বাস,
সিন্ধুর তরঙ্গের মতো উচ্ছ্বাস,
ধুলোর মেঘে সূর্যালোক নিষ্প্রভ,
সংঘর্ষে অগ্নিকণা ওড়ে বাতাসে,
পদাঘাতে মৃত্তিকা ফেটে যায়।
প্রমত্ত
পড়ে আঘাতের পর আঘাত,
দত্ত, প্রতিহত, প্রত্যর্পিত —
আরো!
প্রভু, আমি অনেক যুদ্ধ দেখলাম, কিন্তু এমন আর দেখিনি,
আমি ঈর্ষা করি না তাদের, যারা এই দৃশ্য দেখছে না।
রক্তক্ষরণে রঞ্জিত হ'য়ে
দুই দেহ যেন পুষ্পিত দুই শাল্মলীবৃক্ষ।
কখনো প'ড়ে যান ভীমসেন, কখনো দুর্যোধন,

সংক্রান্তি

কিন্তু মুহূর্ত পরে আবার তাঁরা দুর্ধর্ষ—
দু-জনেই—না, এখন শুধু একজন—
আমি দেখছি ভীম ক্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছেন,
তাঁর ভঙ্গি তেমন তীব্র নয় আর,
আঘাত তেমন ক্ষিপ্র নয়—
প্রভু, আপনি সত্য বলেছিলেন,
গদাযুদ্ধে আপনার পুত্র অপরাজেয়।
সূর্য আরো পশ্চিমে।

ধৃতরাষ্ট্র

(সোল্লাসে)

উৎসব, গান্ধারী! তোমার আকাঙ্ক্ষিত উৎসব!
আমার বহুকালের প্রতীক্ষিত সমাপন!

সঞ্জয়

এতক্ষণ
যারা ছিলো দর্শকমাত্র—নিষ্পলক, নিঃশব্দ,
সেই পাণ্ডবসৈন্যদের মধ্যে এবার
উঠলো গুঞ্জনরব, যেন বিষাদগ্রস্ত।
আর কৃষ্ণ
হঠাৎ এক মুহূর্তের অবকাশে
ভীমসেনকে সংকেত জানালেন
নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত ক'রে;
আমার মনে পড়ছে ভীষণ সেই প্রতিজ্ঞা।

ধৃতরাষ্ট্র

আবার শাঠ্য! আবার ব্যভিচার!
সেই ভণ্ড বর্বর কূটচক্রীর ষড়যন্ত্র!
ঊরুভঙ্গ — নাভির নিম্নে আঘাত,
নীতির বিরুদ্ধে, নিয়মের বিরুদ্ধে —
বিবেকবুদ্ধিকে গোবৎসের মতো বলিদান!
ভাই পাণ্ডু, তুমি মুনির শাপে ভাগ্যবান ছিলে —
এরা কেউ তোমার ঔরসজাত পুত্র নয়।

সঞ্জয়

হুংকৃত হলেন দুর্যোধন .
'নিশ্চল কেন, ভীম? তোমার দম্ভ কেন নিস্তেজ?
কে কার কৃতান্ত তার প্রমাণ হোক।'
আর ভীমসেন
রন্ধনশালায় মৎস্যলোভী মার্জারের মতো
বক্র চোখে তাকালেন
দুর্যোধনের পীন, দৃঢ় ঊরুর দিকে — তাঁর পত্নীদের
পক্ষে আদরণীয়।

ধৃতরাষ্ট্র

শত্রুকে সময় দিয়ো না, দুর্যোধন!
শিখে নাও পাণ্ডবের কাছে পৈশুন্য, কৃষ্ণের কাছে চাতুরী,
আঘাত করো কুটিল — অতর্কিত — উপাংশু —
ভীমসেন সরল মৃত্যুর যোগ্য নয়।

সঞ্জয়

ঋজু আঘাত করলেন দুর্যোধন,
ভীমের গদা স্খলিত হ'লো ভূমিতে।

ধৃতরাষ্ট্র

পুত্র, এই তোমার সুযোগ!
এইবার পিষ্ট করো পাষণ্ডকে।

গান্ধারী

না, দুর্যোধন!
নিরস্ত্রকে আঘাত কোরো না,
তোমার একটিমাত্র সত্যকে অক্ষত রাখো!

ধৃতরাষ্ট্র

দূর হও, উন্মাদিনী পুত্রহন্ত্রী!

সঞ্জয়

গদা তুলে নিয়ে ভীম
আরো একবার কটাক্ষপাতে লেহন করলেন
দুর্যোধনের কটি, উরু, জানুদ্বয়।
কিন্তু দুর্যোধন নিঃশঙ্ক, অসন্দিগ্ধ,
তাঁর স্কন্ধে বীরোচিত স্পর্ধা, সংহত শক্তি তাঁর বাহুতে।

পাণ্ডবেরা উৎকণ্ঠিত দর্শক.
অগ্রে এখন যুধিষ্ঠির। তিনি দৃষ্টিপাত করলেন ভীমের দিকে।

ধৃতরাষ্ট্র

(ব্যাকুলভাবে)

যুধিষ্ঠির, তুমি—
তোমাকে বলি : প্রবুদ্ধ হও, ভুলো না—
ভুলো না তুমি ধর্মের পুত্র, ধর্মের চেয়ে মহৎ কোনো দেবতা নেই,
ভুলো না সেই অরণ্যবাসী তপস্বীদের, যাঁরা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন,
ভুলো না সেই যক্ষরূপী দেবতাকে, যিনি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলেন,
ভুলো না তোমার স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমা, তোমার অন্তর্নিহিত প্রীতি,
ভুলো না কুন্তী এখনো পঞ্চপুত্রবতী, তোমার জ্যেষ্ঠা মাতার একটিমাত্র অবশিষ্ট—
নিবৃত্ত করো, নিবৃত্ত করো অন্যায় যুদ্ধ,
প্রমাণ করো তুমি পুণ্যাত্মা, বন্দনীয় হও বিশ্বের—
দুর্যোধনকে জীবিত রাখো, যুধিষ্ঠির,
বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে হত্যা কোরো না!

সঞ্জয়

চারিদিকে দীপ্তি ছড়িয়ে দুর্যোধন
উল্লম্ফনে উঠে গেলেন শূন্যে,
তাঁর হাতে গদা উত্তোলিত, ভীমসেনের মস্তক লক্ষ্য ক'রে—

এই বুঝি বিদীর্ণ — কিন্তু না — অকস্মাৎ —
কুরুপতি. আমাকে মৌনের আদেশ দিন।

ধৃতরাষ্ট্র

(আর্ত চীৎকারে)

ধর্মপুত্র তুমিও তবে বিশ্বাসহন্তা!

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা]

গান্ধারী

(রুদ্ধ স্বরে)

আমার পুত্র কোথায়?

সঞ্জয়

মাতা, আমাকে ক্ষমা করবেন — আমি সত্যকথনে প্রতিশ্রুত আছি।
বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের মতো
দুর্যোধন প'ড়ে আছেন ভূপৃষ্ঠে —
ভগ্নজানু, চলৎশক্তিহীন।

ধৃতরাষ্ট্র

(প্রজ্বলিত রোষে)

যাও, সঞ্জয়, নিয়ে এসো —
আমি রাজা. আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি -

যাও,
যে-কোনো ছলে, কৌশলে, মিথ্যায়
নিয়ে এসো টেনে সেই পাপিষ্ঠকে
এখানে, আমার মুষ্টির মধ্যে একবার।
যৌবনে আমি ছিলাম ব্যায়ামসিদ্ধ—
গান্ধারী, তুমি তো জানো, তুমি তো দেখেছিলে
আমি মুষ্ট্যাঘাতে দীর্ণ করেছি লৌহমূর্তি,
চূর্ণ করেছি মল্লযোদ্ধার পঞ্জর—
সেই বল আবার আমার শরীরে,
আমার বক্ষ স্ফারিত হচ্ছে, শোণিত উত্তপ্ত—
নিয়ে এসো—
আমি তাকে আলিঙ্গন করতে চাই—
প্রেমালিঙ্গন, মর্মান্তিক প্রেম—
প'ড়ে থাকবে তোমায় পায়ের কাছে, গান্ধারী,
সেই স্থূল মাংসপিণ্ড, কোনো দেবতার পুত্র ব'লে ঘোষিত—
আমি বিশ্বাস করি না!
আমার মনে হয় কুন্তীকে একবার গ্রহণ করেছিলো
অরণ্যে কোনো রাক্ষস—যেমন হিড়িম্বাকে, সে।
সঞ্জয়, যাও!

গান্ধারী

হায়, শক্তিহীন বার্ধক্য!
সঞ্জয়, তার জ্ঞান আছে কি? কষ্ট পাচ্ছে?

সঞ্জয়

অর্ধ-শয়ান,
পৃষ্ঠরেখা বঙ্কিম,
কফোনির চাপে ভূমি নিষ্পেষিত,
চেষ্টার চাপে পরিস্ফীত বাহু,
সিংহতুল্য মস্তক উত্তোলন ক'রে
একবার জ্বলন্ত চোখে তাকালেন তিনি।
'ক্ষত্রবংশের কলঙ্ক তোমরা, পাণ্ডবগণ,
অনপনেয় কলঙ্ক, চিরকালের মতো ঘৃণ্য —
আমাকেও অন্যায় যুদ্ধে বধ করলে!'
উত্তরে হেসে উঠলেন যুধিষ্ঠির :
'দুর্যোধন, তুমি কি এখনো জানো না
ক্ষত্রধর্ম নিষ্ঠুর, নির্বিকার,
তাতে দয়ার কোনো স্থান নেই, ন্যায়ের কোনো স্থান নেই,
কোনো যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়!'

ধৃতরাষ্ট্র

(আর্ত চীৎকারে)

গান্ধারী, তুমি আমারই মতো অন্ধ ছিলে এতদিন!
এবার দুই চক্ষু মেলে তাকিয়ে
দ্যাখো
দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে, দুর্যোধনের সঙ্গে এক শয্যায়
তোমার সত্যের নিপাতন, তোমার ধর্মের অপমৃত্যু!

গান্ধারী

কেউ তার কাছে নেই, সঞ্জয়? কেউ তার মুখে জল দেবে না?

ধৃতরাষ্ট্র

দুর্যোধন, ওঠো! ভান কোরো না:
মনে নেই তোমার শির কত উন্নত, গর্ব কত অটল—
সেবাগ্রহণে অবজ্ঞা, ক্ষুৎপিপাসায় অক্লেশ,
বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় নিতেও অভিমান?
সেই তুমি—না!
আমি মানি না তুমি আজ অসহায়—মানতে পারি না।
ওঠো, দুর্যোধন—প্রমাণ দাও, প্রমাণ করো নিজেকে।
ওঠো—ওঠো—ওঠো—ওঠো!
—যুধিষ্ঠির, তুমি আমাকে এই করলে!

গান্ধারী

সঞ্জয়, সে কি ঘুমিয়ে পড়ছে?

সঞ্জয়

কখনো মুদ্রিত,
কখনো উন্মীল তাঁর চক্ষু,
মাঝে-মাঝে চক্ষুপল্লব কম্পিত,
মাঝে-মাঝে ওষ্ঠাধরে সঞ্চালিত তাঁর জিহ্বা।

গান্ধারী

তৃষ্ণার্ত।

সঞ্জয়

এগিয়ে এলো
ধনুর্বাণ ছেড়ে,
হ্রদের জলে তৃণ পূর্ণ ক'রে
এক কিরাতবংশীয় সৈনিক।
নত হ'লো তৃষ্ণার্তের সামনে।

গান্ধারী

ধন্য পশুপতির প্রিয়
কিরাতবংশ!

সঞ্জয়

তিনি এগিয়ে দিলেন গ্রীবা, তাঁর ওষ্ঠাধর খুলে গেলো,
কিন্তু তাঁর কণ্ঠ থেকে হঠাৎ
উদ্‌গীর্ণ হ'লো ঝলকে-ঝলকে রক্ত—
একটি রক্তিম ধারা মাটিতে
বিভক্ত হ'য়ে, ধীরে মিলিয়ে গেলো
সূর্যাস্তের লোহিতবর্ণ আলোর মধ্যে।
তাঁর মাথা এলিয়ে পড়লো, দীর্ঘ দেহ লম্বমান।

গান্ধারী

(ক্রন্দনজড়িত স্বরে)

বাছা, ফিরে আয়! ফিরে আয় শিশু হ'য়ে আমার কোলে—
শুধু সদ্যোজাত শিশুরা নিষ্পাপ।
ভরতশ্রেষ্ঠ, আমাকে স্পর্শ করো। আমাকে আলিঙ্গন করো, স্বামী—
যদি পারো, আরো একটি পুত্র দাও আমাকে।
তাকে নিয়ে, এই রাজপুরী ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে
আমি অনেক দূরে কোনো নির্জন বনে চ'লে যাই।

ধৃতরাষ্ট্র

বনে, নির্জনে—যেখানেই যাও,
আছে জন্ম, জীবন, জীবনের শৃঙ্খল।
শিশুরাও নিষ্পাপ নয়, গান্ধারী।
মাতার স্তন্যে সংক্রমিত হয় পাপ,
পৃথিবীর অন্নে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
সব কর্মে পাপ, সব ধর্মাচরণে পাপ—
দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরে কোনো ভেদ নেই।
বিলাপ করো, পুণ্যবতী! ক্রন্দন তোলো, মাতা!
তোমার অশ্রুজলে বিধাতাকে লজ্জা দাও।

গান্ধারী

(অশ্রুবেগ সংবরণ ক'রে)

সঞ্জয়, কেউ কি তার ক্ষতস্থানে চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছে?

সঞ্জয়

বিন্দু-বিন্দু সদ্যাশিশিরে ধৌত,
সান্ধ্য আলোর চন্দনরাগে লিপ্ত,
আরো একবার অর্ধোত্থিত, চেষ্টাপরায়ণ,
তিনি হানলেন দৃষ্টি থেকে স্ফুলিঙ্গ,
বাহু দিলেন বাড়িয়ে, যেন অস্ত্রধারণের জন্য,
আরো একবার গর্জন ক'রে বললেন—কিন্তু কোনো বাক্য
গঠিত হ'লো না,
শুধু আদিম কোনো কন্ঠনাদ মিলিয়ে গেলো
ক্ষীণতর হ'য়ে, শূন্যে।
আমি দেখছি পাংশুতা তাঁর আননে, তাঁর কনকবর্ণ ধীরে-ধীরে
ধূসর,
ধীরে-ধীরে চোখের জ্যোতি নিবে যায়, যেন দিনের শেষ রশ্মি।
তাঁর মাথা,
এখনো কেশরগুচ্ছে মনোহর,
ঠেকলো এবার পৃথিবীর মাটিতে, যা জীবন ভ'রে তাঁর কাংক্ষণীয়
ছিলো,
প্রসারিত হ'লো হস্তপদ, আর বিশাল, শক্তিপুঞ্জ শরীর
এতক্ষণে সব উদ্যম হারিয়ে
কোনো উৎপাটিত অশ্বত্থের মতো বিস্তীর্ণ হ'লো—
স্তব্ধ, স্পন্দনহীন, সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট।

গান্ধারী

(রুদ্ধ স্বরে)

এখন আর বলিষ্ঠ নয়। মা-কে তার প্রয়োজন।

সঞ্জয়, আমাকে নিয়ে চলো। আমি তাকে নিয়ে থাকতে চাই
একান্তে—
এই রাত্রির অন্ধকারে গুণ্ঠিত—
যতক্ষণ না সূর্যের আলোয় আবার
উদ্‌ঘাটিত হয় জীবন—মৃত্যুর চেয়েও নিষ্ঠুর।

ধৃতরাষ্ট্র

রুদ্ধ হোক সূর্যোদয়! নির্বাপিত হোক জ্যোতিষ্কেরা!
বিধ্বস্ত হোক দিন, রাত্রি, বৎসর!
আমারই চক্ষুর মতো চরাচর হোক অন্ধকার,
সব হৃদয় প্রস্তর হ'য়ে যাক,
সব বেদনা লুপ্ত,
লুপ্ত আশা, উৎকণ্ঠা, আন্দোলন, ক্রন্দন।
হায়, পুত্র! হায়, সংসার! হায়, মরত্ব!

গান্ধারী

স্বামী, নম্র হও। মৃত্যুও এক দেবতা, তাঁকে প্রণাম করো।
বলো আমার সংগে সমস্বরে :
'পুত্র, তুমি অনেক যুদ্ধ করেছো, এখন নিদ্রা যাও,
অনেক অশান্তির পর শান্তি হোক তোমার।
জীবিতেরা সর্বদা মৃত্যুর ভয়ে অস্থির,
তুমি সেই ভয় থেকে নিষ্ক্রান্ত। বিশ্রাম করো।'

সঞ্জয়

মহাকাল! মহান! আমিও প্রণাম করি তোমাকে।
লোকে তোমাকে বলে দণ্ডধারী, দণ্ডদাতা,
কিন্তু আমার মনে হয় স্বহস্তে তুমি সংহার করো না,
শুধু হরণ করো বুদ্ধি, রোপণ করো উন্মাদনা।
আর এমনি ক'রে ইন্দ্রগণ পতিত হন,
মানুষের ইতিহাসে আসে ক্রান্তিকাল,
মহৎ বংশ লুপ্ত হ'য়ে যায়।

প্রায়শ্চিত্ত

উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস-এর 'Purgatory' নাটকের অনুলিখন।

চরিত্র

এক বালক

এক বৃদ্ধ

মুখবন্ধ

এই নাটিকায় আমি মূলের পটভূমি কেন বদলে দিয়েছি তার জন্য পাঠকের কাছে একটা কৈফিয়ৎ বোধহয় দেয়া দরকার। প্রথমত, আইরিশ-ইংরেজের কূট সম্পর্ক ও আয়র্লণ্ডের প্রান্তর-পর্বতের নাম বাংলায় বসাতে গেলে প্রয়োজন হ'তো পাদটীকার — কেননা 'রাজা অয়দিপৌস' বা 'ম্যাকবেথ'-এর মতো 'পার্গেটরি' কোনো বহুশ্রুত ও বহুপঠিত কাব্য নয় — এতে উল্লিখিত ভূগোল ও ইতিহাস বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজেও অস্পষ্ট। কিঞ্চিদধিক দু-শো পঙক্তির মধ্যে যেখানে একটি মহৎ ট্র্যাজেডিকে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, নাট্যকলার সেই অপূর্ব নিদর্শনে কোনো ব্যাখ্যা জুড়তে আমার মন সরলো না · পাঠকের মনের উপর ইয়েটসের প্রতিভার রশ্মি অব্যাঘাতে বিকীর্ণ হোক, সবার উপরে এ-ই আমি ইচ্ছে করেছিলাম। আর সেটাই প্রধান কারণ, যেজন্য এটিকে স্থাপন করলাম ভারতবর্ষে, বাদশাহি আমল ও সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমিকায়। অন্য দিক থেকেও এই ভারতীকরণে একটি সংগতি আমি দেখতে পেলাম : নাটকটির বহিরঙ্গ আইরিশ ও শিরোনামা খৃষ্টান হ'লেও এর ভিতরকার কথাটি হিন্দুভাবাপন্ন।

তাছাড়া, 'প্রায়শ্চিত্ত' ঠিক অনুবাদও নয়, অনুলিখন; ইয়েটসের আঁটো, ঘন, মিতকথন শৈলীকে সম্মান জানিয়ে আমি প্রতিটি ভাষণে পঙক্তিসংখ্যা মূলের ঠিক সমান রেখেছি, কিন্তু প্রতিটি বাক্যের অনুসরণ করিনি; — পাত্রপাত্রীরা নামহীন ব'লে, বাংলা সর্বনামে লিঙ্গ-ভেদ নেই ব'লে, এবং কিছুটা ছন্দসৌষম্যের তাগিদেও আক্ষরিক আনুগত্য ছেড়ে শুধু ভাবার্থটুকু গ্রহণ করেছি। নাটকটিকে বাংলায় প্রাণবন্ত ক'রে তোলার এটাই আমার প্রকৃষ্ট পথ মনে হ'লো।

[দৃশ্য — একটা ধ্বসে-পড়া বাড়ি, পিছনের দিকে একটি নিষ্পত্র বৃক্ষ।]

বালক

আধেক দোর, আবছা দোর,
দিন-রাত্তির এদিক-ওদিক,
পাহাড় ভেঙে, গর্তে নেমে, মস্ত ঝোলা কাঁধে —
তোমার বাক্যি শোনা!

বৃদ্ধ

লক্ষ ক'রে দ্যাখ
এই বাড়িটা। গল্প ছিলো, ঠাট্টা ছিলো অনেক:
সেবার কার্তিকের শুরুতে বুড়ো গোমস্তা
কী না বলেছিলো শরাবখোর কোচোয়ানটাকে —
আমি চেষ্টা করি মনে আনতে, পারি না।
আর আমি না-পারলে কেউ বেঁচে নেই, পারবে।
চৌকাঠ গেছে শুয়োরের খোঁয়াড়ে তাপ্পি লাগাতে —
সেই বাড়ির হাসিগল্প কোথায়?

বালক

তুমি তাহ'লে এই পথে আগেও এসেছো?

বৃদ্ধ

পথের উপর চাঁদের আলো,
দালানটাতে ঝাপসা মেঘের ছায়া—
এটা সাংকেতিক। গাছটাকে লক্ষ ক'রে দ্যাখ,
কিসের মতো দেখতে?

বালক

বুড়ো হাবড়ার মতো।

বৃদ্ধ

দেখতে যেন—কিসের মতো, কিছু এসে যায় না।
এক বছর আগে দে'খেছিলাম ঠিক এমনি ন্যাংটো,
তাই চ'লে গেলাম অন্য কাজে।
দেখেছিলাম পঞ্চাশ বছর আগে,
তখনও বাজ প'ড়ে ঝাঁঝরা হ'য়ে যায়নি,
সবুজ পাতা, টসটসে পাতা, মাখনের মতো ঘন,
রসে বসায় তেলতেলে জ্যান্ত। দাঁড়া ওখানে, তাকিয়ে থাক,
বাড়িটার মধ্যে কেউ নড়ছে।

[বালকটি বস্তা নামিয়ে দরজার ধারে দাঁড়ালো।]

বালক

কেউ নেই এখানে।

বৃদ্ধ

কেউ আছে ওখানে।

বালক

মেঝে নেই, জানলাগুলো লোপাট,
আর যা ভেবেছিলাম ছাদ, তা আকাশ।
আর এখানে কোন শালিখের বাসা থেকে ছিটকে
প'ড়ে আছে ডিমের খোলার টুকরো।

বৃদ্ধ

কিন্তু কেউ-কেউ
কী রইলো, কী ফুরোলো, গ্রাহ্য করে না :
প্রেতাত্মা, মধ্যপথে ঝুলছে, আসে ফিরে
স্বস্থানে, চেনাশোনা জায়গায়।

বালক

আবার তুমি বিলকুল পাগলা!

বৃদ্ধ

ফিরে আসে
আবার সেই পাপের মধ্যে বাঁচতে, তাও একবার নয়,

অনেক বার; অবশেষে চৈতন্য হ'লো তাদের
কর্মফল এড়ানো যায় না, আর তার ভুক্তভোগী
এখন তারা নিজেরাও, অন্যেরাও।
অন্যদের ব্যাপারে অন্যেরা কাজে লাগতে পারে,
কেননা কর্মফল ফুরিয়ে যাবে যখন
এই স্বপ্নেরও অবসান হ'তে বাধ্য। কিন্তু নিজেদের দুর্ভোগ থেকে
নিষ্কৃতির উপায় তারা নিজেরাই — অন্য কেউ নয় —
যদি না কোনো ঈশ্বর দয়া করেন।

বালক

আর শুনতে চাই না!
শালিকগুলোকে শোনাও তোমার বকুনি।

বৃদ্ধ

থাম। ঐ পাথরটার উপর ব'সে নে।
এই সেই বাড়ি, আমি জন্মেছিলাম যেখানে।

বালক

সেই বনেদি বাড়ি, যেটা ছাই হয়েছিলো আগুনে?

বৃদ্ধ

আমার মা — তোর ঠাকমা — লোকে বলতো রায়গঞ্জের রানী,
এটা ছিলো তাঁর। মস্ত দিঘি, ঝাউবন, চারদিকের দৃশ্য,
আস্তাবলে ঘোড়া, খাঁচায় পোরা চিতাবাঘ।

প্রায়শ্চিত্ত

একটা ঘোড়া ছিলো হুতোমডাঙার ময়দানে,
সেখানে দেখা আমার বাবার সঙ্গে — এক বরকন্দাজ।
তাকালেন ছোকরার দিকে, তাকে বিয়ে করলেন।
তাঁর মা আর মেয়ের সঙ্গে কথা বলেননি —
ঠিক করেছিলেন!

বালক

চুলোয় যাক ঠিক আর বেঠিক!
আমার ঠাকুর্দা পেয়েছিলেন বৌ, আর কাঁড়ি-কাঁড়ি মোহর।

বৃদ্ধ

তাকালেন তার দিকে, বিয়ে করলেন,
আর ছোকরা ফুঁকে দিলো তাঁর সর্বস্ব।
তিনি জানলেন না সর্বনাশের খবর,
আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেলেন।
কিন্তু এখন — মৃত ব'লেই — সব জানেন তিনি।
এই বাড়িতে কত জীবন, কত মৃত্যু, কত মস্ত মানুষ :
জঙ্গি বাহাদুর, পরগনার শেরেস্তাদার,
মনসবদার, মহারাজের দেওয়ান, আর যাঁরা
অনেকদিন আগে
লাড়েছিলেন মৈশূরে, ভরতপুরে।
কেউ-কেউ কোম্পানির কাজে হিল্লি-দিল্লি ঘুরে
ফিরেছেন মৃত্যুর আগে বাড়িতে,
বা বছর-বছর চৈত্রমাসে এসেছেন
দিল্লি থেকে, গুল্মোরের বাহার দেখতে।

কত টান তাঁদের—সেই গাছগুলো কেটে ফেললে ছোকরা
জুয়োর দেনা মেটাবার জন্য,
মদে আর মেয়েমানুষে ওড়াবার জন্য।
কত টান তাঁদের—এই বাড়ির
সব গলি, চাতাল, চিলেকোঠার উপর মমতা;
ছোকরা মেরে ফেললো বাড়িটাকে; আর যে-বাড়িতে
মস্ত লোকেরা বড়ো হয়েছেন, বিয়ে করেছেন, গঙ্গা পেয়েছেন,
তার হত্যাকারীকে আমি দেবো মৃত্যুদণ্ড!

বালক

বাপ্‌স্‌! কী ভাগ্যি তোমার! জমকালো সাজ,
আর জমকালো ঘোড়ার পিঠে বেড়ানো।

বৃদ্ধ

যাতে আমি তারই মতো মুখ্যু হ'য়ে থাকি,
আমাকে ইশকুলেও ভর্তি করেনি লোকটা। কিন্তু কেউ-কেউ
আধখানা ভালোবাসতো আমাকে, আমার মায়ের আধখানার জন্য।
আমাকে পড়তে শেখালো এক কায়েৎ-গিন্নি,
এক তান্ত্রিক সাধু সংস্কৃত শেখালেন।
বই ছিলো অজস্র—সংস্কৃত, ফার্সি, ইংরিজি,
তালপাতার পুঁথি, গিল্টি-করা ইস্পাহানি বাঁধাই,
আদ্যিকালের, হাল আমলের—পঞ্চাশ মন বই।

বালক

আর তুমি আমাকে উত্তম লেখাপড়া শেখালে!

বৃদ্ধ

শিখিয়েছি ঠিক সেটুকু, তোর মতো ঢ্যামনাকে যা মানায়।
বাপ বাউণ্ডুলে, মা এক বাগদি ছুকরি,
জোট বেঁধেছিলো রাস্তার ধারে খানার মধ্যে।
আমার যখন ষোলো বছর পূর্ণ, আমার পিতৃদেব
মদে চুর হ'য়ে লঙ্কাকাণ্ড ঘটালেন।

বালক

আমার বয়স এখন ঠিক তা-ই। ষোলো পূর্ণ
এই সেদিন, বন-বিবির মেলায়।

বৃদ্ধ

সব ভস্ম হ'লো।
বই—দেড়শো বছর ধ'রে জমানো বই—ভস্ম।

বালক

রাস্তায় শুনি গুজব—তা কি সত্যি?
বাড়িতে যখন আগুন, তুমি খুন করেছিলে তাকে?

বৃদ্ধ

কেউ নেই তো এখানে—শুধু আমরা দু-জন?

বালক

কেউ নেই, বাবা।

বৃদ্ধ

দিয়েছিলাম লম্বা ছোরা বিঁধিয়ে,
যা দিয়ে এখন বন-মুর্গির গলা কাটি, খাবার জন্য।
লোকটাকে জ্বলন্ত ঘরে ফেলে এলাম,
টেনে বের করলো অন্যেরা। কেউ-কেউ
দেখতে পেলো তলপেটের ফুটো, কিন্তু পা থেকে মাথা পর্যন্ত
এমন মিশকালো আঙার — কে বলবে ওটা কী।
কিন্তু একদিন তার মাইফেলের ইয়ারবক্সিরা ব'লে উঠলো,
'মা-কালীর দিব্যি, ছোঁড়াটাকে আমরা ফাঁসিকাঠে লটকাবো!'
রটিয়ে দিলে ঝগড়াঝাঁটির কেচ্ছা, কবে আমি মারতে উঠেছিলাম।
সেই কায়েৎ-ঠাকরুন দিলেন কিছু কাপড়-জামা,
আমি এক দৌড়ে উধাও, গতর খাটি হাটে-গঞ্জে ঘুরে,
তারপর হলাম শস্তা মালের ফেরিওলা —
ছোটো কাজ, কিন্তু আমি বলি দিব্যি,
যেহেতু আমার পিতারই আমি পুত্র,
যেহেতু একটি কর্ম আমি করেছিলাম, আরো একটি করতে
পারি।
শোন — ঐ ঘোড়ার খুর! শুনছিস?

বালক

কোনো শব্দ নেই।

বৃদ্ধ

ঘোড়ার খুর! ঘোড়ার খুর!
এখন সেই মাস, সেই তিথি, সেই লগ্ন,
যে-রাতে আমার মা-র বিয়ে হয়েছিলো,
কিংবা তাঁর গর্ভে আমি এসেছিলাম।
লোকটা ফিরে আসছে শরাবখানা থেকে
কোমরবন্ধে এক বোতল ব্রান্ডি।

[একটি জানলায় আলো জ্ব'লে উঠলো, দেখা গেলো একটি তরুণী মেয়েকে।]

দ্যাখ চেয়ে জানলাটাতে ; ঐ যে তিনি দাঁড়িয়ে,
শুনছেন — অন্য কেউ জেগে নেই বাড়িতে।
একলা তিনি, আর লোকটা এত রাত্তির পর্যন্ত
মদ গিলেছে আর ডম্ফ মেরেছে শরাবখানায়।

বালক

কিছু নেই — শুধু মস্ত ফাঁক দেয়ালে।
সব তোমার ধাপ্পা। না — সত্যি তুমি পাগল,
দিনে-দিনে একদম পাগল!

বৃদ্ধ

এখন আরো জোর হ'লো আওয়াজ! আসছে লোকটা
পাথর-বসানো সেই পথের উপর দিয়ে,
যেখানে আজ আগাছার জঙ্গল।
বাগান পেরিয়ে ঘুরে গেলো উল্টো দিকে
আস্তাবলে ঘোড়া বেঁধে রাখতে।

দোর খুলতে নামলেন তিনি একতলায়—
আজ রাত্রে সোয়ামির মতোই বিভোল।
মাতাল—তাতে কী এসে যায়,
ছোকরার জন্য খ্যাপার মতো অবস্থা। দু-জনে উঠলো সিঁড়ি দিয়ে।
তিনি নিয়ে এলেন ছোকরাকে তাঁর নিজের ঘরে—
ফুলশয্যা, তাঁর বাসর-ঘর
জানলায় আলো আবার ঝাপসা।

না— ও যেন স্পর্শ না করে তোমাকে! সত্য নয়
যে মাতাল পুরুষ গর্ভাধানে অক্ষম।
স্পর্শ যদি করে, তোমার গর্ভের নিস্তার নেই,
তোমাকে জন্ম দিতে হবে পিতৃহন্তার।
শুনছে না! কেউ শুনছে না! ঢিল ছুঁড়বো,
ভেঙে ফেলবো শার্সি—তবু শুনবে না!
—প্রমাণ হ'লো, আমার মাথার মধ্যে ইস্কুরুপ আলগা।
কিন্তু সমস্যা এই : রায়গঞ্জের রানী, বরকন্দাজের বৌ—
মনস্তাপের তাড়নায় তাঁকে বাঁচতে হবে আবার
সব দিন, সব রাত্রি, সব ঘটনা। তবু
তিনি কি পারবেন এই রমণকর্মে ফিরতে
বিনা সুখে, নিষ্কাম? যদি না পারেন,
যদি সুখের মধ্যেই মনস্তাপ মিশে থাকে—
কোনটা বড়ো?

আমার বিদ্যে বড়ো অল্প।

যা ডেকে আন মাধবাচার্যকে; তিনি আর আমি
ব'সে-ব'সে এই সমস্যার জট ছাড়াই,

যতক্ষণ পালঙ্কে শুয়ে ওরা দু-জন
আমাকে জন্ম দিতে ব্যস্ত।

দাঁড়া — ফিরে আয়!

ভেবেছিলি এই ফাঁকে চম্পট দিবি
আমার টাকার থলি মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে,
আর আমি বকুনির ঘোরে টের পাবো না!
বস্তার মধ্যে ঘাঁটছিলি তুই?

[জানলায় আলো মিলিয়ে গেলো।]

বালক

আমার পাওনা এবার কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দাও।

বৃদ্ধ

এই উঠতি বয়সে হাতে কিছু পেলেই
তক্ষুনি তুই মদ গিলে উড়িয়ে দিবি।

বালক

দেবো তো দেবো! আমার ন্যায্য পাওনা
আমি ঘাড় মুচড়ে আদায় করবো, যেমন খুশি খর্চা।

বৃদ্ধ

চিল্লানি থামা। দে আমার থলি।

বালক

কক্‌খনো না!

বৃদ্ধ

হাড্ডি ভেঙে দেবো—সাবধান!

[দু-জনের মধ্যে থলি নিয়ে কাড়াকাড়ি। থলি খ'সে পড়লো, টাকা ছড়িয়ে গেলো মাটিতে। বৃদ্ধটি প'ড়ে যেতে-যেতে নিজেকে সামলে নিলো। মুখোমুখি দাঁড়ালো দু-জনে, চোখে-চোখে তাকিয়ে। জানলায় আলো জ্ব'লে উঠলো। দেখা গেলো একটি পুরুষ গেলাশে মদ ঢালছে।]

বালক

আমার ঠাকুর্দা তখন বুড়ো, তুমি জোয়ান,
আর এখন আমি জোয়ান, তুমি বুড়ো।
তেমনি আমি খুন করি যদি তোমাকে?

বৃদ্ধ

(জানলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে)

আরো খাপসুরৎ—সেই ষোলো বছর—

বালক

কী বকছো তুমি বিড়বিড় ক'রে?

বৃদ্ধ

দেখতে আরো ছোকরা—তবু
আমার মা শুধু চেহারা দেখে ভুললেন কেন?

বালক

কী ভাবছো ব'লেই ফ্যালো না ঝটপট!

[বৃদ্ধ জানলার দিকে আঙুল তুলে দেখালো।]

মা দুর্গা! জানলায় দেখছি আলো,
আর কে যেন আছে দাঁড়িয়ে,
যদিও দেয়াল মেঝে কোন জন্মে ছারখার।

বৃদ্ধ

জানলার আলোয় চেয়ে দ্যাখ আমার বাবাকে,
ব্রান্ডিপানি ঢেলে দিচ্ছে গলায়,
ক্লান্ত একটা পশুর মতো ভঙ্গি।

বালক

মরা, জ্যান্ত, গুম-খুন একটা মানুষ!

বৃদ্ধ

'তখন স্বয়ং ব্রহ্মা হৈল দুই খণ্ড' :
—কোথায় পড়েছিলাম?

কিন্তু না -

প্রায়শ্চিত্ত

কিছু নেই জানলায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে
শুধু আমার মায়ের মনের প্রতিবিম্ব।
মৃত—তাঁর মনস্তাপে তিনি একলা।

বালক

একটা মিশকালো লাশ—আমার জন্মের আগে
হাড়গোড় সুদ্ধ ভস্ম! ভীষণ—ভীষণ—ভীষণ!

[হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললো।]

বৃদ্ধ

ঐ জন্তুটা কিছুই নয়, কিছুই বুঝবে না!
ওর জানলার তলায় কেউ কাউকে খুন ক'রে ফেললে
ও তাকিয়েও দেখবে না একবার।

[বালকের বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিলো।]

আমার পিতা—আমার পুত্র—একই লম্বা ছোরাতে!
এই অক্কা পেলি—এই—এই—এই—

[বৃদ্ধ বার-বার ছোরা বসালো। জানালা অন্ধকার হ'লো।]

'খোকনমণি, সোনার খনি, থামাও এবার কান্না,
বাপ তোমার চাঁদ-সদাগর, মা রাজার কন্যা।'
—ভুল হ'লো। ওটা শুনেছিলাম কায়েৎ-গিন্নির মুখে,

কিন্তু আমি গান ধরলে গাইতে হবে আমার মায়ের জন্য।
আর পদ্য আমার আসে না।

[মঞ্চ অন্ধকার, শুধু গাছটির উপর শাদা আলো পড়লো।]

গাছটাকে লক্ষ করো এবার :
পুণ্যাত্মা কোনো পুরুষ যেন দাঁড়িয়ে আছেন,
শাদা, ঠাণ্ডা, শান্ত এক আলোর পুঞ্জ।
মা গো, আবার তোমার জানলা হ'লো আঁধার,
কিন্তু তুমি আছো আলোয়, যেহেতু আমি
সব কর্মফল নিঃশেষ ক'রে দিয়েছি।
ছেলেটাকে মেরে ফেলতে হ'লো, যাতে ওর জন্যেও
কোনো মেয়েমানুষ উদমো হ'য়ে না ওঠে,
যাতে পাপ রক্তে আবার কারো জন্ম না হয়।
আমি তো একটা কুচ্ছিৎ বুড়ো হাভাতে—
আমাকে দিয়ে আব ভয় নেই। এই লম্বা ছোরাটাকে
এবার সেঁধিয়ে দেবো ঘাসের চাপড়ায়,
টেনে তুলবো ঝকঝকে পরিষ্কার,
নেবো কুড়িয়ে ছড়ানো-ছিটোনো রেস্ত,
তারপর অনেক দূরে অন্য কোথাও
নতুন লোকেদের পুরোনো গল্প শোনাবো।

[ছোরা পরিষ্কার ক'রে ছড়ানো টাকা তুলতে লাগলো।]

ঘোড়ার খুর—শব্দ! হা ভগবান,
এখনই ফিরে এলো আবার—শব্দ, সেই শব্দ!

মা গো, এই স্বপ্ন কি তোমার অসহ্য?
দুইবার হত্যাকারী, কিন্তু সব নিষ্ফল হ'লো।
সেই মৃত রাত্রি, তোমাকেই তুলতে হবে বাঁচিয়ে-
একবার নয়, বার-বার, বার-বার!

ভগবান,

এই স্বপ্ন থেকে দাও তাঁকে নিষ্কৃতি!
এর বেশি মানুষের সাধ্য নেই। নিবিয়ে দাও
জীবিতের যন্ত্রণা আর মৃতের মনস্তাপ।

ইক্কাকু সেন্নিন

একটি নো-নাটকের অনুলিখন

মূল লেখক : কোম্পারু মোতায়াসু

(১৪৫৩-১৫৩২)

চরিত্র

ইক্ষ্বাকু
শ্রীমতী সেন্দা (এঁর কথা নেই)
এক রাজপুরুষ
দুই পাল্কিবাহক
দুই দৈত্য-দেবতা
দৈত্য-দেবতার দল (এঁদের কথা নেই)

কোরাস

'সেম্নিন', 'সেন্দা', ও 'সাকে' শব্দে দন্ত্য স-এর উচ্চারণ সংস্কৃত অনুযায়ী।

মুখবন্ধ

এই নাটকে যাঁর নাম ইক্কাকু, তিনি যে আমাদের চিরপরিচিত ঋষ্যশৃঙ্গেরই জাপানি অবতার তা কাউকে ব'লে দেবার অপেক্ষা রাখে না। ধ'রে নেয়া যায়, সংস্কৃত 'একশৃঙ্গ' শব্দই জাপানি জিহ্বায় ইক্কাকুতে রূপান্তরিত হয়েছিলো; পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে মহাভারতের মুনিবরও ছিলেন মৃগীপুত্র ও একশৃঙ্গধারী। 'ঋষ্য' শব্দের অর্থ হরিণ, অর্থাৎ হরিণের মতো শিং যাঁর আছে তিনিই ঋষ্যশৃঙ্গ। ভাবতে অবাক লাগে, বৈদিক ইন্দ্র থেকে উদ্ভূত এই বৃষ্টিদাতার খ্যাতি আর্যবাসিত বিশাল ভূখণ্ড পেরিয়ে দূর নিপ্পন পর্যন্ত পৌঁচেছিলো, তাঁর উপাখ্যান অবলম্বনে একটি প্রাচীনতর নো এবং একটি কাবুকি নাটকেরও উল্লেখ আমি পেয়েছি, যদিও তার কোনোটাই পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে 'ইক্কাকু সেন্নিন' থেকেই বোঝা যায়, হিমদেশবাসী কিমোনো-পরিহিত সাকে-পায়ী কবিরা, তাঁদের শিন্তো ও Zen-প্রসূত মানসতা নিয়ে, হিন্দু রসবস্তুকে কেমন চমকপ্রদ নতুন রূপে সাজিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু রূপান্তর নয় এটাকে জন্মান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা প্রথমেই লক্ষ করি যে ঋষ্যশৃঙ্গ জাপানের মাটিতে পা

দিয়ে তাঁর কৈশোর ও সরলতা এবং হয়তো বা কৌমার্যও হারিয়েছিলেন। ইক্ষ্বাকুর বয়সের উল্লেখ নেই, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায় তিনি কোনো কিশোর ব্রহ্মচারী নন, তিনি সংসার বিষয়ে অভিজ্ঞ; পূর্বে নারী দেখেছেন, সুরা তাঁর অচেনা কোনো বস্তু নয়, রাজপুরী ও রাজকন্যা বিষয়েও তাঁর ধারণা আছে। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের মতোই শাকাহারী ও অরণ্যবাসী, কিন্তু অহমিকা থেকে মুক্ত তিনি নন ('ওরা দর্শন চায়, আমি দেবো ওদের দর্শন'); তাঁর ব্যক্তিত্বে একটি অংশ আছে শিল্পীর ('আমি গান গাই আপন মনে, একলা'); এবং আগন্তুকদের সঙ্গে প্রথম দফায় তাঁর ব্যবহারেও সাধুজনোচিত দয়ার বদলে বিবিক্ত ও আত্মসচেতন শিল্পীর রুক্ষতাই প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর পরবর্তী নম্রতার কারণও ধর্মবুদ্ধি নয়, সেন্দার রূপযৌবনের আকর্ষণ। মোটের উপর তাঁর চরিত্রে তপস্বীর চাইতে শিল্পী-জাদুকরের অংশই প্রবলতর, কোনো আধ্যাত্মিক মহত্ত্বে তিনি চিহ্নিত হননি। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকাতেও বিপর্যয় ঘটেছে: যে-বৃত্রাসুর ঋগ্বেদে মেঘবন্ধন করেছিলো, এখানে তারই বংশধরগণ 'বৃষ্টিদাতা দৈত্য-দেবতা' রূপে উল্লিখিত, এবং বৃত্রের ভূমিকায় ইক্ষ্বাকু-ঋষ্যশৃঙ্গই অবতীর্ণ। বৃত্রের ছিলো ইন্দ্রের প্রতি বহুকাল-সঞ্চিত হিংস্র বিদ্বেষ; সে-তুলনায় ইক্ষ্বাকুর মেঘরোধ এক লঘু ও আকস্মিক ঘটনা; তাঁর প্রথম সুন্দর ভাষণটি প'ড়ে মনে হয় এটা তাঁর কাছে একটা প্রমোদ বা বিলাসমাত্র, ফলাফল বিষয়ে চিন্তা না-ক'রে নিজের ক্ষমতার স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তিনি ক'রে যাচ্ছেন, প্রায় বালকের মতো খেলাচ্ছলে। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর 'পতনে'ও ত্রাতা (যদিও তাঁর নিজের অজান্তে), কিন্তু ইক্ষ্বাকুর চরিত্রে যেটুকু রমণীয়তা আছে তা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক নয়, নান্দনিক।

অপহারিকা নায়িকাটিরও অদ্ভুত রূপান্তর ঘটেছে। মহাভারতকার তার নাম উল্লেখ না-ক'রেও তাকে একটি বৃহৎ ও নাটকীয় ভূমিকা দিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী সেন্দা আদ্যন্ত নীরব, এমনকি সে নৃত্যেও যোগ দিচ্ছে না, দু-একবার ইক্ষ্বাকুকে মদ ঢেলে দেয়া ছাড়া আর কোনো নাট্যকর্ম তাকে দেয়া হয়নি। আমি অনুমান করছি জাপানি মঞ্চের অভিনেতা (নো বা কাবুকিতে অভিনেত্রী গৃহীত হয় না) শুধু মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সেন্দার মৌন উপস্থিতিকে

সজীব ক'রে তোলেন; আর যখন সে কার্যসিদ্ধি ক'রে দ্রুত চ'লে যেতে থাকে তখন বচনের অভাব সত্ত্বেও আমরা তাকে এক চতুর লুব্ধিকা ব'লে অনুভব করি।

'ইক্ষাকু সেন্নিন'-এ একটি অসংগতি আমাকে পীড়া দিয়েছে, তা হ'লো অনাবৃষ্টির পরেই জাপানি হৈমন্তিক দৃশ্যের অবতারণা। সেন্দাকে যে-পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা ক্লেশকর হ'লেও বিশুষ্ক নয়; যেখানে অত কুয়াশা সেখানে সজলতার অভাব থাকতে পারে না, আর ঠান্ডা দেশের হেমন্ত বলতে—শুধু রক্তবর্ণ ঝরা পাতা নয়, মেঘ ও বৃষ্টি, ও তুষারপাতের আসন্নতাও আমাদের মনে পড়ে। শুধু একটি উপায়ে এই বিরোধের নিরসন সম্ভব—যদি ধ'রে নিই নাটিকাটি দুই দেশের মধ্যে দোলায়মান; অনাবৃষ্টি ও পরবর্তী বৃষ্টিপাত বারাণসীর ঘটনা, আর তপস্বীহরণ অনুষ্ঠিত হ'লো জাপানের কোনো পার্বত্য বনভূমিতে। এটা আমাদের হিশেবে কষ্টকল্পনা, কিন্তু জাপানি চিত্তের রসবোধ এতে বিঘ্নিত হবার কথা নয়, কেননা নো-নাটক সম্পূর্ণভাবে প্রচলনির্ভর ও বাস্তবতাবিমুখ। এই স্থানভেদ বোঝাবার জন্য, ইক্ষাকু ঘুমিয়ে পড়ার পর কোরাসের উক্তির শেষ পঙক্তিতে আমি 'বারাণসী' কথাটা বসিয়ে দিয়েছি মূলে সেটা নেই। ('তাঁরা পৌঁছে গেছেন রাজসভায়, বারাণসীধামে।')

রচনাকালে যে-পুঁথি আমার অবলম্বন ছিলো, তাতে নাটিকাটির তিনটি লেখন মুদ্রিত আছে: (১) রোমান হরফে মূল জাপানি, (২) একটি পঙক্তিনিষ্ঠ আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ, ও (৩) সেই আক্ষরিক অনুবাদের একটি কাব্যিক পুনর্লিখন। প্রথমটি থেকে আমি বুঝে নিতে পেরেছি কোন-কোন পঙক্তি পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, এবং 'বারানা' (বারাণসী) বা 'ইক্ষাকু' শব্দ কোথায়-কোথায় আছে অথবা নেই; তৃতীয়টি আমাকে ধ্বনির দিক থেকে কিছুটা সাহায্য করেছে; কিন্তু আমার প্রধান নির্ভর ও আমার পক্ষে 'মূল' রচনা ছিলো দ্বিতীয়টি; আমি তারই সাহায্যে পৃথক করতে পেরেছি কবিতা, গদ্য ও গানের অংশ, ধরতে পেরেছি সঠিক চিত্রকল্পগুলিকে, বিভিন্ন পঙক্তি ও অংশসমূহের বার্তা বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে পেরেছি। কিন্তু আমার লেখাটা, পাঠককে বলা দরকার, কোনো অর্থেই অনুবাদ নয়; উপরোক্ত ইংরেজি লেখন দুটির কোনোটার সঙ্গেই এর পুরোপুরি

সাদৃশ্য নেই। এতে অনেক পঙক্তি বা শব্দবন্ধ আছে যা আমার স্বাধীন রচনা, কিন্তু এমন কিছু নেই যা, আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি জাপানি কবির শৈলীবিরোধী বা অভিপ্রায়বহির্ভূত। শব্দ বা পঙক্তির নিবিষ্ট অনুসরণ নয়, নাটিকাটির সামগ্রিক পরিকল্পনা ও গঠনশিল্পকে বাংলা ভাষায় মূর্ত ক'রে তোলাই আমার উদ্দেশ্য ছিলো, যেমন ছিলো 'পার্গেটরি'র অনুলিখনেও। পক্ষান্তরে, আমি এটিকে কোনোভাবেই ভারতীকৃত বা বঙ্গীকৃত করিনি, সম্পূর্ণ বজায় রেখেছি এর জাপানিত্ব [এমনকি 'আস্তিন' সুদ্ধু, তা বাঙালির কানে যতই না বিজাতীয় শোনাক], কেননা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে যা পরিধান ক'রে থাকেন সেই কিমোনোর অতি প্রশস্ত আস্তিন জাপানি সাহিত্যে ঠিক তেমনি ভাবানুষঙ্গময়, যেমন আমাদের সাহিত্যে মেয়েদের বস্ত্রাঞ্চল। নাটকটি অতি ঘনিষ্ঠভাবে ও সর্বাঙ্গীণভাবে জাপানি ব'লে তার স্বদেশীয় সংসর্গ থেকে তাকে কোনো অনুপুঙ্খেই বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব ছিলো না।

নো-নাট্যশিল্পে মঞ্চসজ্জা থাকে যৎকিঞ্চিৎ, কিন্তু, পাত্রপাত্রীর বেশভূষা হয় বহুযত্নসাধিত, প্রধান চরিত্রের (এ-ক্ষেত্রে ইক্ষাকু) মুখ চরিত্রসম্মত মুখোশে ঢাকা থাকে। কোরাসের সংখ্যা সাধারণত আট থেকে বারো, যন্ত্রবাদকের সংখ্যা চার। মঞ্চ-সম্পত্তির ব্যবহার প্রায় নেই। ধরা যাক 'ইক্ষাকু সেন্নিন'-এ যে-সব উপকরণের উল্লেখ আছে, যেমন পাল্কি ও মদের ভাঁড়, গুহা ও প্রস্তরস্তূপ—এ-সব কিছুই মঞ্চে দেখানো হবে না, শুধু অভিনেতাদের অঙ্গভঙ্গি অথবা ভাষানির্ভর বর্ণনার দ্বারা বোঝানো হবে, এই হ'লো নো-র একটি মূলনীতি। এদিক থেকে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে।

ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও একটি বিষয়ের উল্লেখ না-ক'রে পারছি না। পূর্বোক্ত ইংরেজি পুনর্লিখনটিতে ইক্ষাকুর নামান্তর বা বিশেষণ হিশেবে, মার্কিন কবি অনবরত 'য়ুনিকর্ন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আক্ষরিক অনুবাদক একবারও তা করেননি। 'য়ুনিকর্ন'-এর খৃষ্টান অনুষঙ্গ মনে রাখলে, জাপানি সাহিত্যে তার আমদানি নিতান্ত অসংগত ব'লে মনে হয়, অথচ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ একশৃঙ্গ

(লাতিন uni-, এক + cornu, শৃঙ্গ) অতএব এই ব্যবহারকে প্রসঙ্গের পক্ষে অনুচিতও বলা যায় না। এখন আমার প্রশ্ন: এই যে য়ুনিকর্ন, একশৃঙ্গধারী শ্বেতবর্ণ অশ্বাকৃতি কাল্পনিক জন্তু, যা খৃষ্টান লোকশিল্পে পবিত্রতা ও কৌমার্যের প্রতীক, তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের কোনো সম্পর্ক আছে কি? আমার কলাম্বিয়া বিশ্বকোষ বলছে য়ুনিকর্ন-এর উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ, কিন্তু দুঃখের বিষয় আর-কোনো তথ্য সেখানে নেই। শর্টার অক্সফোর্ড অভিধানে দেখছি, ইহুদি পুরাণের য়ুনিকর্ন ছিলো বন্য বৃষ, পরবর্তী কালে শব্দটি শৃঙ্গনাসা গণ্ডার (গ্রীক rhino, নাসা + keros, শৃঙ্গ) অর্থেও ব্যবহৃত হ'তো। এদিকে মনিয়র-উইলিয়মস-এর সংস্কৃত অভিধান অনুসারে 'শৃঙ্গ' শব্দের নানা অর্থের মধ্যে একটি হ'লো শক্তিমত্তা বা কামোচ্ছ্বাস, এবং 'শৃঙ্গার'-এর (রতিক্রিয়া) আক্ষরিক অর্থ শৃঙ্গধারী, আর 'গণ্ড' শব্দে যেমন গণ্ডার, তেমনি বীর অথবা শ্রেষ্ঠও বোঝায়। প্রত্নতত্ত্বের একটি বইয়ে দেখলাম, মোহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত দুটি শীলমোহরে একটি একশৃঙ্গধারী চতুষ্পদ জন্তু চিত্রিত আছে কিছুটা অশ্বাকৃতি কিন্তু পুরোপুরি নয়, তার পুরুষাঙ্গ বৃষের মতো সুচিহ্নিত, লেখক তাকে 'য়ুনিকর্ন' ব'লে আখ্যাত করেছেন অবশ্য উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে। এখন কথাটা এই যে ভারতবর্ষীয় শৃঙ্গনাসা গণ্ডারই যেহেতু একমাত্র প্রকৃত জন্তু যাকে দেখতে মনে হয় একশৃঙ্গধারী, তাই এমন অনুমান খুবই যুক্তিসংগত যে সেই জন্তুরই মূর্তি বা চিত্র বা জনরব থেকে খৃষ্টান য়োরোপে য়ুনিকর্ন-কল্পনার উদ্ভব হয়েছিলো। এশিয়া-মহাদেশে এই সংস্কার এখনো প্রচলিত আছে যে গণ্ডারের শিং গুঁড়ো ক'রে খেলে যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, আর য়োরোপীয় সংস্কার অনুসারে য়ুনিকর্ন-শৃঙ্গ বিষব্যাধির প্রতিষেধক। এই আরোগ্যের ক্ষমতায় য়ুনিকর্নের সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের সম্বন্ধ আরো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে; তিনিও মহাচিকিৎসক, তাঁর স্তম্ভিত বীর্য স্খলিত হওয়ামাত্র প্রকৃতি আবার প্রজননশক্তি ফিরে পেলো। যে-শৃঙ্গ যৌনতার প্রতীক, তা-ই রূপান্তরিত হ'লো কৌমার্যের চিহ্নে, এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা মানুষের কল্পনায় এই ধরনের বৈপরীত্য-আরোপ সহজেই ঘ'টে থাকে। তাছাড়া, য়ুনিকর্নও মৃদুস্বভাব ব'লে কথিত নয়; ঐ ধবলকান্তি চিরপবিত্র প্রাণীটি

ইক্ষাকু সেন্নিন

লোক-কল্পনায় কী-রকম দুর্দান্ত হ'য়ে উঠতে পারে তা ইয়েটস-এর 'দি য়ুনিকর্ন ফ্রম দি স্টার্স' নাটকটি পড়লেই বোঝা যায়। আমার নানারকম সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে; প্রশ্নটি গবেষণা বা গোয়েন্দা-গিরির অযোগ্য নয়।

রাজপুরুষ

আমি সেবক এক রাজার, তাঁর জন্ম বারাণসীধামে
গঙ্গার তীরে বিস্তারিত রাজত্ব।
তাঁর দেশে এক তপস্বীর বাস, তপস্বী জাদুকর,
হরিণীর গর্ভে জন্ম, কপাল থেকে শিং বেরিয়েছে,
লম্বা একটি শিং, তাই একশৃঙ্গ নাম—
আমরা বলি ইক্কাকু সেন্নিন, একশৃঙ্গ মুনি।
একবার বাধলো যুদ্ধ, তপস্বী ও দৈত্য-দানোয়।
মন্ত্রের জোরে জাদুকর
দৈত্যদের বন্দী করলেন গুহার মধ্যে, গুহার মুখ বন্ধ।
কিন্তু দৈত্যেরাও দেবতা, তাঁদের দান বৃষ্টি,
তাঁরা যেহেতু বন্দী, তাই বহুকাল বৃষ্টি নেই।
রাজার মনে শোক, মাটির বুক শুকনো,
রাজা ভাবছেন উপায়, দৈত্যদের মুক্তি দিতে হবে।
তাঁর ফন্দি এই : এই মেয়ে, শ্রীমতী সেন্দা
আমরা যাকে নিয়ে যাচ্ছি পাল্কিতে, তুলনাহীন সুন্দরী,
নিয়ে যাচ্ছি তপস্বীর কাছে পর্বতচূড়ায়।
রাজা চান ইক্কাকুর মনে ভ্রান্তি জাগাতে
মেয়েটি যেন পথ-হারানো বিপন্না—
তাকে দেখে চঞ্চল, কামার্ত,
মুগ্ধ মনে বিহ্বল স্বরে তিনি ব'লে উঠবেন—

আমি তোমাকে চাই, দূর হোক আমার জাদুবিদ্যা।'
—এমনি ভাবছেন আমাদের রাজা,
আর আমরা তাই নিয়ে চলেছি সেন্দাকে, অতি কঠিন পথ পেরিয়ে
পর্বতচূড়ায়
যেখানে ইক্ষাকু দিন কাটান একলা—
আমরা তা-ই শুনেছি।

পথ-চলার গান

[রাজপুরুষের সঙ্গে দুই পাল্কি-বাহক যোগ দিলো।]

যেদিকে চাই, শুধু পাহাড় অফুরান,
হারায় পথিকেরা কুয়াশায়,
আর্ত পাইন-বনে বিপুল গর্জনে
তীক্ষ্ণ হিম হাওয়া ব'য়ে যায়।
স্বপ্নে তন্দ্রায় যে থাকে ডুবে থাক,
আমরা অবিরল চলেছি।

হিমেল কুয়াশার অন্ধকারে
কোথাও নেই কোনো নির্ভর,
এদিকে পর্বত রুদ্ধ করে পথ,
ওদিকে তলহীন গহ্বর।
স্বপ্নে তন্দ্রায় যে থাকে ডুবে থাক,
আমরা অসহায় চলেছি।

কে দেবে আশ্বাস ক্লান্ত পথিকেরে
হবে না নিষ্ফল অভিযান,

কোথায় বাঁধে ঘর সে-বীর জাদুকর,
কে জানে নির্ভুল সন্ধান।
শঙ্কাময় পথে লক্ষ্যহীন
আমরা কতকাল চলবো!

রাজপুরুষ

অনেক দিন হ'লো—অনেক দিন। আমরা চলছি আর দুলছি, কাঁপছি আর ভাবছি। অনেক দিন। আর এখনো জানি না কোথায়, যত চলছি ততই পথ হারিয়ে যাচ্ছে।...কিন্তু হঠাৎ এই পাথরের স্তূপ—অদ্ভুত, যেন কেউ সাজিয়ে রেখেছে মনে হয়—কে? আরে, একটা পাইন-পাতার ছাউনি দেখছি, বেড়ার গায়ে কস্তুরীলতা উঠেছে—এখানেই কি ইক্ষাকু থাকেন? এসো চারদিকে তাকিয়ে দেখা যাক।

ইক্ষাকু

(ঘরের ভিতরে)

আমি তুলে আনি সব নদীর জল, গভীর জল,
উপড়ে আনি উপত্যকার ঝর্না,
আমি চাপিয়ে দিই চুল্লিতে সব মেঘেদের,
জ্বাল দিয়ে-দিয়ে ফোটাই, তুলি বুদ্‌বুদ,
জ্বাল দিয়ে-দিয়ে ফাঁপিয়ে, তুলি ফেনিয়ে
আমার মন্ত্রে, আমার মোহন মন্ত্রে!
আমি গান গাই আপন মনে, একলা।
গান থামে, তখনও কেউ আসে না।

নদীর ধারে-ধারে পাহাড়গুলো সার বেঁধে দাঁড়ায়,
সবুজ পাতা হ'য়ে ওঠে লাল।
আমি গান গাই একলা এই হেমন্তে।

রাজপুরুষ

শুনছেন? আমার কথা শুনছেন?
আমার নিবেদন আছে। শুনুন!

ইক্ষাকু

আঃ-হা! লুকিয়ে ছিলাম বনের মধ্যে, চারদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়, ভেবেছিলাম কোনো মানুষ আমাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু এখানেও লোকজন! চ'লে যাও! চ'লে যাও তোমরা!

রাজপুরুষ

আমরা পথিক, আমরা পথ হারিয়েছি। সূর্য অস্ত গেলো, এখনই অন্ধকার নামবে। আজ রাতের মতো আশ্রয় চাই আমরা—দয়া করুন, আমাদের আশ্রয় দিন।

ইক্ষাকু

না, না! এখানে কোনো আশ্রয় নেই, কোনো মানুষ এখানে আসতে পারে না, থাকতে পারে না। তোমরা যাও—এক্ষুনি চ'লে যাও।

রাজপুরুষ

কোনো মানুষ এখানে আসতে পারে না? তাহ'লে আপনি কে? কোনো জাদুকর-মুনি? আপনি বেরিয়ে আসুন, আমরা আপনার দর্শন চাই।

ইক্ষাকু

এই উঠছি আমি, এই বেরিয়ে আসছি।
ওরা দর্শন চায়, আমি দেবো ওদের দর্শন।

কোরাস

(ইক্ষাকুর মুখের কথা তুলে নিয়ে)

ঘাসের দোর
ঘাসের দোর ঠেলে, খুলে, দুলিয়ে দিয়ে
ঐ আসছেন তিনি লম্বা পা ফেলে।
দ্যাখো, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দ্যাখো,
কালো চুল কপাল জুড়ে লুটোচ্ছে,
আর মধ্যিখানে শৃঙ্গ, তাঁর একটিমাত্র শৃঙ্গ।
তিনি দাঁড়িয়ে, আমরা দেখছি,
এক মুহূর্ত—
এক মুহূর্ত
আশ্চর্য এক ঘটনা!

রাজপুরুষ

আমরা বহুকাল ধ'রে একশৃঙ্গ মুনির কথা শুনেছি। আপনিই তিনি?

ইক্ষাকু

লজ্জার কথা—কিন্তু সত্য। আমিই সেই ইক্ষাকু সেম্নিন—'একশৃঙ্গ'। এই মেয়ে—যুবতী। সুন্দরী। কেন এই কষ্টের পথে বেরিয়েছে? মনে হয় কোনো রাজকন্যা, কোনো রাজপুরীর রত্ন।

দ্বিতীয়ার চাঁদ ভুরুর ভঙ্গি,
অঙ্গে ঝালর মখমল।

কোনো সাধারণ মানবী নয়। তোমরা কারা বলো তো?

রাজপুরুষ

বিশেষ কেউ নই। বিদেশী পথিক, পথ হারিয়েছি। আমরা সঙ্গে এনেছি ভাঁড়-ভর্তি সাকে, পথের কষ্ট কাটাবার জন্য। আপনি গ্রহণ করলে ধন্য হবো আমরা। এই যে, আসুন।

ইক্ষাকু

আমরা তপস্বী। আমরা আহার করি পাইনের পাতা, শ্যাওলায় তৈরি কাপড় পরি। কস্তুরীলতায় শিশির জ'মে থাকে, তাই আমাদের পানীয়। বছরের পর বছর কেটে যায়, আমরা থাকি যেমন আছি তেমনি। কোনো বদল নেই। বার্ধক্য নেই। মৃত্যু নেই। সাকে আমি চাই না।

রাজপুরুষ

আপনার যা অভিরুচি তা-ই হবে। তবু···আমরা যখন বিনয় ক'রে বলেছি, আর-একবার ভেবে দেখবেন না?

প্রথম পাল্কি-বাহক

শ্রীমতী সেন্দা পাত্র হাতে উঠে দাঁড়ালেন,
নত হলেন তপস্বীর সামনে।

দ্বিতীয় পাল্কি-বাহক

শ্রীমতী সেন্দা ঢেলে দিলেন মদ,
মিনতি করছেন মোহন ছাঁদে একশৃঙ্গকে।

ইক্ষাকু

এরা শরণার্থী, আশ্রয় চায়। এদের বিমুখ করলে আমার অন্যায় হবে।

কোরাস

শুনলে—কী বললেন তিনি শুনলে?

চাঁদ উঠেছে সন্ধেবেলায় মদের পাত্র,
মদের পাত্র সন্ধেবেলার চাঁদ।
মদের পাত্র তুলে নিলেন মুনি।
মনে নেই কাব্যকথার সেই মুনিকে
যিনি তুলেছিলেন ডাল থেকে চন্দ্রমল্লিকা?
আর সুগন্ধি একটি আস্তিনের ছোঁওয়ায়
ঝ'রে পড়লো শিশির, খ'সে পড়লো পাপড়ি?
সেই একটি মুহূর্ত, অন্য জগতের,

কিন্তু আমাদের এখানে হাজার বছর কেটে যায়।
তেমনি একটি মুহূর্তের জন্য
আমি ভালোবাসবো, আমাকে ভালোবাসতে দাও।

[এই ভাষণ যতক্ষণ চলছে, পাল্কি-বাহকেরা উঠে দাঁড়িয়েছে, মদ ঢেলে দিচ্ছে তপস্বীকে।]

ইক্ষাকু

আনন্দ ... এই সুরা ... স্বর্গসুখ!

কোরাস

আনন্দ — কী আনন্দ!
মদের পাত্র ঘুরে-ঘুরে চলছে,
চাঁদ যেমন রাতের আকাশে ঘুরে যায়, তেমনি।
উপচে পড়ে মদ, উপচে পড়ে চাঁদ।
হেমন্তের লাল পাতা জ্যোৎস্নায়
ঝিলমিল করে নাচের ছন্দে আস্তিন।
লাল পাতা সোনালি, লাল পাতা রুপোলি,
ঝিলমিল করে এক, দুই, তিন আস্তিন
নাচের ছন্দে, নাচের ছন্দে — কী আনন্দ!

[পাল্কি-বাহকেরা নৃত্য শুরু করলো। কিছুক্ষণ পরে ইক্ষাকু তাতে যোগ দিলেন।]

কোরাস

নাচের সঙ্গী মুনি, নাচের সঙ্গী বেহালা,

নাচের সংগী পেয়ালা, নাচের সংগী বাঁশি।
নতুন সুর, নতুন তাল, অবিরাম।
মুনি এখন বিভোর, সুন্দরীকে তাঁর চাই,
তাঁর হৃদয় জুড়ে প্রেম, তাঁর আকাশ ছেয়ে নারী।
পা কাঁপছে তাঁর, তালে ভুল হচ্ছে,
গাড়ি চলছে শিথিল চাকায় নড়বড়ে।
নাচো, আরো নাচো, একশৃংগ!
আর এইবার আস্তিনে মুখ ঢেকে তিনি প'ড়ে গেলেন
হুমড়ি খেয়ে, ঘুমের মধ্যে লেপটে।
এদিকে দ্যাখো সুন্দরীকে, সারা মুখে হাসি, তাঁর কার্যসিদ্ধি
হ'লো।
ডাকলেন তিনি ইঙ্গিতে তাঁর সংগীদের,
'চলো যাই—আর কেন এখানে?'
সেই রুক্ষ পথ পেরিয়ে আবার
পাহাড়ের পর পাহাড় বেয়ে নেমে
গতি এবার দ্রুত, মন উৎফুল্ল—
এরই মধ্যে
তাঁরা পৌঁছে গেছেন রাজসভায়, বারাণসীধামে।

[রাজপুরুষ, সেন্দা ও পাল্কি-বাহকদ্বয়ের প্রস্থান। ইক্ষাকু মেঝের উপর ঘুমন্ত।]

কোরাস

শুনছো শব্দ? ভীষণ। গুহার মধ্য থেকে আসছে নাকি? ঝাপটের পর ঝাপট, যেন পৃথিবী কাঁপছে, আকাশ ফেটে চৌচির।

ইক্ষ্বাকু

(জেগে উঠে)

আশ্চর্য! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মদের আর নারীর নেশায় ভরপুর। আশ্চর্য—আমিও তবে মানুষ।

আর এখন ঐ গর্জন। যেন বাজ পড়ছে, ঝড় উঠলো। যেখানে আমি দৈত্যগুলোকে বন্দী করেছি, সেই গুহার মধ্যে গর্জন। কেন? এর অর্থ কী?

[প্রস্তর-স্তূপ থেকে দৈত্যবেশধারী দুই বালক বেরিয়ে এলো।]

প্রথম দৈত্য

ইক্ষ্বাকু, একশৃঙ্গ, তপস্বী জাদুকর—
কিন্তু আর নও জাদুকর, নও তপস্বী!

দ্বিতীয় দৈত্য

জাদুকরকে জাদু করেছে নারী,
বিজয়ীকে জয় করেছে মদিরা।

প্রথম দৈত্য

তুমি নৃত্য করেছো মানুষীর মোহে উন্মাদ,
তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো মদের ঘোরে নির্বোধ—
সেই ঘুমের মধ্যে চুরি হ'য়ে গেছে
তোমার ভেল্কি, তোমার জারিজুরি, তোমার বিদ্যে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দৈত্য

(একসঙ্গে)

এবার শাস্তি নাও, ইক্ষ্বাকু, দেবতার হাতে শাস্তি!

কোরাস

ঝড় উঠলো উত্তাল, ঝড় উঠলো উত্তাল,
আকাশ ঝাপসা, চাঁদ ডুবলো অন্ধকারে,
পাহাড়ের গায়ে ফাটল, আকাশের মুখ ঝাঁঝরা,
ঝড় উঠলো উত্তাল।
গুহার দোরে ঝাঁকানি, দেয়াল ধ্বসে পড়ছে,
ছিটকে উড়ে যায় মস্ত-মস্ত পাথরের চাঁইগুলো।
—ঐ আসছেন দল বেঁধে দৈত্য-দেবতারা!

[প্রস্তর-স্তূপ বিদীর্ণ হ'য়ে গেলো, ভিতর থেকে দৈত্যের দল বেরিয়ে এলেন।]

ইক্ষ্বাকু

ইক্ষ্বাকু, একশৃঙ্গ — কী করবে তুমি এখন?

কোরাস

(দ্রুত নৃত্য বা অঙ্গভঙ্গি সহযোগে)

কী করবেন এখন একশৃঙ্গ তপস্বী?
তিনি আঁকড়ে ধরলেন দু-হাতে তাঁর তলোয়ার।

কিন্তু দৈত্যেরাও দেবতা, দেবতার মতো সমর্থ।
তাঁরা তুলে নিলেন মাটি থেকে ঘাসের কুচি, ঘাস হ'লো
তাঁদের হাতে তলোয়ার,
যুদ্ধ মিটে গেলো মুহূর্তে।
আর নেই মায়াবল ইক্ষাকুর, তিনি ভুলে গেছেন মন্ত্র,
শরীর মন ক্লান্ত, লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।
উল্লাসে আহ্বান পাঠালেন দৈত্য-দেবতারা—
'এসো মেঘেরা—নীল, কালো ধোঁয়াটে মেঘ ছুটে এসো!'
উল্লাসে দৈত্য-দেবতারা স্বর্গ-মর্ত্য ছাপিয়ে
ধ্বনিত করলেন বজ্র, চমক তুললেন বিদ্যুতে,
আকাশটাকে ফাটিয়ে দিয়ে ঝর্ঝর
ঝর্ঝর বৃষ্টি নামিয়ে আনলেন, বন্যার মতো শব্দে।
আর এখন তাঁরা আকাশ পেরিয়ে সমুদ্র ছাড়িয়ে
অবশেষে তাঁদের দৈত্যধামে ফিরে যাচ্ছেন।